আক্বায়েদ শিক্ষা

তৃতীয় খণ্ড

মূলঃ আয়াতুল্লাহ্ মুহাম্মদ তাকী মিসবাহ্ ইয়াযদী

অনুবাদঃ মুহাম্মদ মাঈন উদ্দিন

প্রকাশনায়ঃ

আহলে বাইত (আ.) বিশ্ব সংস্থা

আমুজেশে আক্বায়েদ

মূলঃ আয়াতুল্লাহ্ মুহাম্মদ তাকী মিসবাহ্ ইয়াযদী

অনুবাদঃ মুহাম্মদ মাঈন উদ্দিন

প্রকাশনায়ঃ

আহলে বাইত (আ.) বিশ্ব সংস্থা

প্রকাশ:

আরাবী ১৪২৪

বাংলা ১৪১০

ইংরেজী ২০০৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

পুনরুত্থান দিবস পরিচিতি

তৃতীয় খণ্ড

১ম পাঠ

পুনরুত্থান দিবসের পরিচিতির গুরুত্ব

ভূমিকা :

এ পুস্তকের প্রারম্ভে দ্বীন ও এর মৌলিক বিশ্বাসসমূহের (তাওহীদ, নবুয়্যত ও পুনরুত্থান) উপর অনুসন্ধানের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং উল্লেখ করেছি যে, মানুষের জীবন মানবীয় হওয়ার ব্যাপারটি উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রকৃত সমাধানের উপর নির্ভরশীল। প্রথম খণ্ডে খোদা পরিচিতি, দ্বিতীয় খণ্ডে পথপ্রদর্শক পরিচিতি ও পথনির্দেশিকা পরিচিতি (নবুয়্যত ও ইমামত) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখন আমরা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পুনরুত্থান বা মাআদ (معاد) সম্পর্কে "পুনরুত্থান দিবসের পরিচিতির গুরুত্ব" শিরোনামে আলোচনায় মনোনিবেশ করব।

প্রারম্ভেই এ মৌলিক বিশ্বাসের বিশেষত্ব এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে তার ভূমিকা বর্ণনা করব। অতঃপর বিশ্লেষণ করব যে, মাআদের প্রকৃত ধারনালাভ বিমূর্ত ও অমর আত্মার প্রতি (روح) বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সম্পর্কিত। যেমনকরে 'অস্তিত্ব পরিচিতি'একক প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত অপূর্ণ থাকে, তেমনি 'মানব পরিচিতিও'অমর রূহের বিশ্বাস ব্যতীত অসমাপ্ত থাকে। অবশেষে পুনরুত্থানের মৌলিক বিষয়সমূহকে এ পুস্তকের প্রচলিত রীতিতে ব্যাখ্যা করব ।

পুনরুত্থান দিবসের প্রতি বিশ্বাসের গুরুত্ব :

প্রয়োজন ও চাহিদার যোগান দান, মূল্যবোধ অর্জন এবং পরিশেষে চূড়ান্ত সৌভাগ্য ও উৎকর্ষে পৌঁছাই হল মানুষের কর্মানুরাগের কারণ। আর কর্মের মান ও গুণ এবং এগুলোর দিকনির্দেশনার প্রক্রিয়া বিভিন্ন উদ্দেশ্য নির্ধারণের উপর নির্ভরশীল এবং জীবনের সকল প্রচেষ্টা ঐ সকল উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যেই সম্পাদিত হয়ে থাকে ।

অতএব জীবনের সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ, কার্যক্রমের দিকনির্দেশনা প্রদান ও কর্ম নির্বাচনের ক্ষেত্রে মৌলিক ভূমিকা রাখে। প্রকৃতপক্ষে জীবনের অনুসৃত নীতি নির্ধারণের নির্বাহক, স্বীয় বাস্তবতা, উৎকর্ষ ও কল্যাণ সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির ধরন থেকে রূপলাভ করে। ফলে যিনি ধুমাত্র ব গত উপাদানসমূহ ও এ গুলোর জটিল ক্রিয়া- প্রক্রিয়ার সমষ্টিকেই স্বীয় জীবনের বাস্তবতা বলে মনে করেন এবং নিজ জীবনকে সীমাব পার্থিব ইহকালীন জীবনের মধ্যেই সীমাব বলে ভাবেন এবং ভোগ, বিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্যকে এ ইহকালীন জীবনের চাওয়া- পাওয়া ব্যতীত কিছু ভাবতে পারেন না, তবে তিনি তার জীবনের কর্মসূচীকে এমনভাবে সজ্জিত করবেন, যা কেবলমাত্র পার্থিব চাহিদা পূরণ করবে। অপরদিকে যিনি জীবনের বাস্তবতাকে ব গত বিষয়ের উর্ধ্বে বলে মনে করেন এবং মৃত্যুই জীবনের পরিসমাপ্তি নয় বলে জানেন ; বরং মনে করেন যে, মৃত্যু হল এ নশ্বর পার্থিব জীবন থেকে অবিনশ্বর জীবনে পদার্পণের পথে একটি স্থানান্তর বিন্দু এবং যিনি স্বীয় সঠিক আচার- আচরণকে অশেষ কল্যাণ ও উৎকর্ষের মাধ্যম বলে মনে করেন, তবে তিনি তার জীবনের কর্মসূচীকে এমন ভাবে বিন্যাস করবেন, যাতে পরকালীন জীবনে অধিকতর লাভবান হতে পারেন। ফলে পার্থিব জীবনের কষ্ট ও বিফলতা, তাকে হতাশ ও নিরাশ করতে পারে না এবং স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন, অনন্ত সৌভাগ্য ও উৎকর্ষের পথে প্রচেষ্টা চালানো থেকে তাকে বিরত রাখতে পারে না।

এ দু'ধরনের মানব পরিচিতি ধুমাত্র মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের উপর প্রভাব ফেলে না বরং তাদের সামাজিক জীবন ও পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। এছাড়া পরকালীন জীবন এবং চিরন্তন সাচ্ছন্দ্য ও শান্তির প্রতি বিশ্বাস, অপরের অধিকার সংরক্ষণ ও দুস্থ মানবতার সেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আর যে সমাজে এ ধরনের বিশ্বাস বিরাজমান, সে সমাজে ন্যায়ভিত্তিক কোন কানুন প্রবর্তন করতে এবং অন্যের প্রতি অন্যায় ও অত্যাচার প্রতিরোধ করতে অপেক্ষাকৃত কম বল প্রয়োগ করতে হয়। স্বভাবতঃই এ বিশ্বাস যতই বিশ্বজনীন ও সার্বজনীন হতে থাকবে, ততই আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহ হ্রাস পেতে থাকবে।

উপরোল্লিখিত বিষয়টির উপর ভিত্তি করে পুনরুত্থানের বিষয় ও এ সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণার গুরুত্ব সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। এমনকি ধুমাত্র তাওহীদের বিশ্বাস (পুনরুত্থানে বিশ্বাস ব্যতীত), জীবনের কাংখিত দিকনির্দেশনার পথে পরিপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। আর এখানেই সকল ঐশী ধর্ম, বিশেষকরে পবিত্র ইসলাম ধর্ম কর্তৃক এ মৌলিক বিশ্বাসের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করার এবং মানুষের অন্তরে এর বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করার জন্যে নবীগণের (আ.) অপরিসীম প্রচেষ্টার রহস্য উদঘাটিত হয়।

পারলৌকিক জীবনের প্রতি বিশ্বাস, একমাত্র তখনই মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচার-আচরণের দিকনির্দেশনা প্রদানের ব্যাপারে স্বীয় ভূমিকা পালন করতে পারবে যখন ইহলৌকিক কর্ম-কাণ্ড ও পরলৌকিক সুখ-দুঃখের মধ্যে একপ্রকার কার্য-কারণগত সম্পর্ক বিদ্যমান বলে গৃহীত হবে এবং ন্যূনতমপক্ষে পারলৌকিক বৈভব ও শাস্তি, ইহলৌকিক সুকর্ম ও দুষ্কর্মের ফলশ্রুতিরূপে পরিগণিত হবে। নতুবা যদি এরূপ মনে করা হয় যে, পরলৌকিক সুখ-সমৃ , এ বিশ্বেই লাভ করা সম্ভব (যেমনকরে পার্থিব সুখ-সমৃ এ পৃথিবীতেই লাভ করা সম্ভব), তবে পারলৌকিক জীবনের প্রতি বিশ্বাস, ইহলৌকিক জীবনের কর্মকাণ্ডের দিকনির্দেশনায় স্বকীয়তা বিবর্জিত হবে। কারণ এরূপ ধারণা পোষণ করার অর্থ হবে : এ বিশ্বে সুখ-সমৃ অর্জনের নিমিত্তে সচেষ্ট হওয়া উচিৎ এবং পরলৌকিক সমৃ লাভ করার জন্যে মরণোত্তর জীবনেই বা পরপারেই সচেষ্ট হতে হবে।

অতএব পুনরুত্থান ও পরলৌকিক জীবনের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি এ দু'লোকের (ইহ ও পারলৌকিক) জীবনের সম্পর্ক এবং অনন্ত সুখ-দুঃখের পথে ঐচ্ছিক ক্রিয়াকলাপের যে প্রভাব বিদ্যমান তা-ও প্রমাণ করতে হবে।

পুনরুত্থান দিবস সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতি কোরানের গুরুত্বারোপ :

কোরানের এক তৃতীয়াংশেরও বেশী আয়াত অনন্ত জীবন সংক্রান্ত : এক শ্রেনীর আয়াত পরকালে বিশ্বাসের আবশ্যকতার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে[১] অপর শ্রেণীর আয়াত পরকালকে

অস্বীকার করার ফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[২] তৃতীয় শ্রেণীর আয়াতে পরকালীন অনন্ত বৈভব সম্পর্কে[৩] এবং চতুর্থ শ্রেণীর আয়াতে অনন্ত শাস্তি সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।[৪]

অনুরূপ সুকর্ম ও কুকর্মের সাথে ঐগুলোর পরকালীন ফলাফল সম্পর্কেও অসংখ্য আয়াতে আলোচিত হয়েছে। এছাড়া একাধিক প তিতে পুনরুত্থানের সম্ভাবনা ও আবশ্যকতা সম্পর্কেও গুরুত্বারোপ ও বর্ণনা করা হয়েছে। আর সেই সাথে কিয়ামত বা বিচার দিবসকে বিস্মৃত হওয়া বা ভুলে যাওয়াই, পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকারকারীদের বিভিন্ন দুষ্কর্ম ও বিচ্যুতির উৎস হিসেবে গণনা করা হয়েছে।[৫] কোরানের বিভিন্ন আয়াত থেকে আমরা পাই যে, পায়গাম্বরগণের (আ.) বক্তব্য ও জনগণের সাথে তর্ক- বিতর্কের একটা প্রধান অংশ জুড়ে ছিল মাআদ বা পুনরুত্থানের ব্যাপার। এমনকি এটুকু বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, এ মূল বিষয়টির প্রতিপাদনের জন্যে তাদের প্রচেষ্টা তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা করার চেয়েও অধিক ছিল। কারণ অধিকাংশ মানুষই এ মৌলিক বিষয়টিকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বেশী বিরোধীতা করেছিল। এ বিরোধিতার কারণকে নিম্নরূপে দু'টি সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করা যেতে পারে : একটি হল, সকল প্রকার অদৃশ্য ও অস্পৃশ্য বিষয়কে অস্বীকার করার সাধারণ কারণ। আর অপরটি হল, কেবলমাত্র মাআদ বা পুনরুত্থান সম্পর্কিত অর্থাৎ উচ্ছৃংখলতা ও উদাসীনতা দায়িত্বহীনতার প্রতি ঝোঁক। কারণ যেমনটি ইতিপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিয়ামত ও বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস দায়িত্ববোধ, ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সীমারেখা মেনে চলা, অত্যাচার ও সীমালংঘন এবং দূর্নীতি ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখার শক্তিশালী সহায়ক। আর এর অস্বীকৃতির মাধ্যমে কামনা, বাসনা ও স্বেচ্ছাচারিতার পথ উন্মুক্ত হয়ে থাকে। পবিত্র কোরানে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

(يَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ)

মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ (গলে যাবার পর) একত্রিত করতে পারব না? ব তঃ আমি তার আংগুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত (প্রথমবারের মত) পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম। তবুও মানুষ তার সম্মুখে যা আছে তা অস্বীকার করতে চায়। (কিয়ামাহ ৩- ৫)

আর পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকার করার মত এ ধরনের মন মানসিকতা প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে খুজে পাওয়া যায়, যারা তাদের বক্তব্যে ও লিখনিতে পুনরুত্থান ও পরকাল এবং এ সম্পর্কিত কোরানের অন্যান্য বক্তব্যকে এ পার্থিব ঘটনাপ্রবাহ ও জাতি বা গোষ্ঠীসমূহের পুনর্জাগরণ ও শ্রেণী বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা কিংবা মর্তের স্বর্গ গড়ার সাথে তুলনা করতে সচেষ্ট অথবা চেষ্টা করেন পরকাল বা এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য ভাবার্থসমূহকে ধুমাত্র মূল্যবোধগত ভাবার্থ বা বিশ্বাসগত অথবা কাল্পনিক বিষয়[৬] বলে ব্যাখ্যা প্রদান করতে। কোরান এ ধরনের লোকদেরকে 'মানব শয়তান' ও 'নবীগনের শত্রু' বলে চিহ্নিত করেছে। এরা তাদের মনোহর ও প্রতারনামূলক বক্তব্যের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় হরণ করে এবং মানুষকে সঠিক বিশ্বাস ও ঐশী বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ থেকে দূরে রাখে।

(وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ)

এরূপে, মানব ও জিনের মধ্যে শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি, প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাদের একে অন্যকে চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত করে; যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন (জোরপূর্বক তাদেরকে বিরত রাখতেন) তবে তারা এটা করত না (কিন্তু আল্লাহ চান মানুষ সঠিক ও ভ্রান্তপথ নির্বাচন করার ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকুক) সুতরাং তুমি তাদেরকে ও তাদের মিথ্যা রচনাকে বর্জন কর। (সূরা আনআম ১১২)

(وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ)

এবং তারা এই উদ্দেশ্যে প্ররোচিত করে যে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের মন যেন তার প্রতি অনুরাগী হয় এবং তাতে যেন তারা পরিতুষ্ট হয়, আর তারা যে অপকর্ম করে তারা যেন তাই করতে থাকে। (সূরা আনাআম - **১১৩**)

উপসংহার:

কোন ব্যক্তি যাতে তার জীবনে এমন পথ নির্বাচন করতে পারে যে, প্রকৃত সৌভাগ্য ও উৎকর্ষ অর্জন করা যায়, তবে তাকে ভেবে দেখা উচিৎ মৃত্যুর সাথেই কি কোন মানুষের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে, না কি অপর কোন জীবন এ জীবনের পরে বিদ্যমান? এ পৃথিবী থেকে অপর কোন জগতে স্থানান্তরিত হওয়ার অর্থ কি এক শহর থেকে অপর শহরে ভ্রমণের মত যে, জীবন ধারণের যাবতীয় সরঞ্জামাদি ঐ স্থানেই সংগ্রহ করতে পারে, নাকি এ ইহলৌকিক জীবন, পরবর্তী জীবনের সুখ- দুঃখের ক্ষেত্র প্র ত করে এবং পরবর্তী জীবনের ভূমিকা স্বরূপ, যার ফলে সকল কর্ম এখানেই সম্পন্ন করতে হবে এবং চূড়ান্ত ফল ওখানে লাভ করতে হবে ?

এ প্রশ্নগুলোর সমাধান না হওয়া পর্যন্ত জীবনের জন্যে সঠিক পথ ও সঠিক অনুসৃত নীতি ও কর্মসূচী নির্বাচনের পালা আসে না। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত গন্তব্য নির্ধারণ না হবে, সেখানে পৌঁছার পথও নির্ধারণ করা যাবে না।

পরিশেষে স্মরণযোগ্য যে, এ ধরনের জীবনের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা যতই দুর্বল হোক না কেন, তা- ই সচেতন ও জ্ঞানী ব্যক্তির জন্যে যথেষ্ট, যা তাকে এ সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণায় বাধ্য করে। কারণ “সম্ভাব্যতার পরিমা” অপরিসীম।

২য় পাঠ

পুনরুত্থানের বিষয়টি রূহের সাথে সম্পর্কিত

জীবন্ত অস্তিত্বে একত্বের ভিত্তি :

মানুষের শরীর সকল প্রাণীর মতই একাধিক কোষের সমষ্টি যাদের প্রত্যেকটিই সর্বদা রাসায়নিক পরিবর্তন, রূপান্তর ও বিবর্তিত অবস্থায় আছে। এদের সংখ্যাও জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পরিবর্তনশীল এবং এমন কোন মানুষ পাওয়া যাবে না যার জীবনে শরীর গঠনকারী উপাদানসমূহ পরিবর্তন হয়নি অথবা যার কোষের সংখ্যা সর্বদা ধ্রুব।

অতএব প্রাণীদেহে এবং বিশেষকরে মানুষের দেহে সংগঠিত এই পরিবর্তন ও রূপান্তরের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন হতে পারে যে, কিসের ভিত্তিতে (একই দেহের একাধিক পরিবর্তন সত্বেত্ত) এ পরিবর্তিত বিষয়গুলোকে অভিন্ন অস্তিত্বরূপে গণনা করা যেতে পারে যদিও তার অঙ্গসমূহ আজীবন অসংখ্য রূপান্তরের সম্মুখীন হয়েছিল ?[৭]

এ প্রশ্নের যে সহজ উত্তরটি দেয়া হয় তা হল : সকল প্রকার জীবন্ত অস্তিত্বেরই একত্বের ভিত্তি হল, তাদের একই সময়ের এবং বিভিন্ন সময়ের অঙ্গ- প্রতঙ্গসমূহের মধ্যে সংযোগ। যদিও দেহের কোষসমূহ ক্রমান্বয়ে মৃত্যু লাভ করে এবং নতুন কোষসমূহ ঐগুলোর স্থান দখল করে, তথাপি এ পরিবর্তিত ধারার সংযুক্তিকে অভিন্ন বিষয় বলে গণনা করা যেতে পারে।

কিন্তু এ জবাবটি সন্তোষজনক উত্তর হতে পারে না। কারণ আমরা যদি ইটের তৈরী কোন একটি ইমারতকে কল্পনা করি যার ইটগুলোকে ক্রমানয়ে এরূপে পরিবর্তন করা হল যে, কিছুদিন পর পূর্ববর্তী কোন ইটই তাতে অবশিষ্ট রইল না, তবে এ নতুন ইটের সমষ্টিকে ঠিক পূর্বের সে ইমারতই বলে মনে করা যাবে না, যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের বক্তব্য শুধুমাত্র তাদের পক্ষ থেকে বিবৃত হয়, যারা সমষ্টির অংশসমূহের পরিবর্তন সম্পর্কে কোন খবর রাখেন না। প্রাগুক্ত প্রশ্নটির জবাবটিকে নিম্নরূপে সম্পূরণ করা যেতে পারে : উল্লেখিত ক্রমানুগতিক

পরিবর্তন কেবলমাত্র তখনই কোন সমষ্টির অভিন্নতার ক্ষেত্রে কোন প্রকার বিপত্তি সৃষ্টি করে না যখন তা কোন এক স্বভাবজাত ও আভ্যন্তরীণ নির্বাহীর ভিত্তিতে সম্পন্ন হবে - যেমনটি জীবন্ত অস্তিত্বের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। তবে ইমারতের ইটসমূহের পরিবর্তন বাহ্যিক ও গাঠনিক নির্বাহীর মাধ্যমে অর্জিত হয় আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে অভিন্নতা ও প্রকৃত একাত্বতাকে অংশসমূহের পরিবর্তন ধারায় ঐগুলোর সগোত্র বলে মনে করা যায় না।

এ জবাবটি সেই স্বভাবজাত একক নির্বাহীর গ্রাহ্যতার উপর নির্ভরশীল যা পরিবর্তন ধারায় সর্বদা অবশিষ্ট থাকে এবং অঙ্গ- প্রত্যঙ্গগত ও অংশগত বিন্যাস ও শৃংখলাকে রক্ষা করে । অতএব স্বয়ং এ নির্বাহী সম্পর্কেই প্রশ্ন আসে যে, প্রকৃতপক্ষে তা কী ? এর একাত্বতার ভিত্তিই বা কী ?

প্রসি দার্শনিক মতবাদানুসারে সকল প্রাকৃতিক অস্তিত্বের একাত্বতার ভিত্তি হল, প্রকৃতি (طبیعت) অথবা গঠন (صورت) [৮]নামক এক অস্পৃশ্য ও সরল (بسیط) (অর্থাৎ যা যৌগিক নয়) বিষয়, যা ব র পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয় না। জীবন্ত অস্তিত্বে যে খাদ্যগ্রহণ, বিকাশ ও প্রজনন প্রক্রিয়ার মত বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন হয়, তাকে নাফস (نفس) বা আত্মা নামকরণ করা হয়।

প্রচীন দার্শনিকগণ উদ্ভিদ ও প্রাণীর নাফস বা আত্মাকে ব গত (مادّی) এবং মনুষ্য আত্মা বা নাফসকে ‘অব গত (مجرد) বলে মনে করতেন। কিন্তু ইসলামী দার্শনিকদের অনেকেই, বিশেষকরে সাদরুল মুতা’ল্লেহীন শিরাজী প্রাণীর নাফসকেও এক পর্যায়ের অব গত বলে মনে করেছেন এবং চেতনা ও প্রত্যয়কে অব গত অস্তিত্বের নির্দেশনা ও অপরিহার্যতা বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ব বাদীরা, যারা অস্তিত্বকে ধুমাত্র ব ও ব র বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে সীমাব বলে মনে করেন, তারা অস্পৃশ্য রূহ বা আল্লাহেক অস্বীকার করে থাকেন। আধুনিক ব বাদীরা (যেমন : পোষ্টিবিষ্টরা) প্রকৃতপক্ষে সকল প্রকার অস্পৃশ্য (অর্থাৎ যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়) বিষয়কেই অস্বীকার করেন বা অস্পৃশ্য বিষয়কে অন্ততঃ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করা যায় না বলে মনে করেন। ফলে তারা প্রকৃতি বা অস্পৃশ্য গঠনকে গ্রহণ করেন না। আর স্বভাবতঃই একাত্বতার ভিত্তি সম্পর্কেও তাদের নিকট কোন সঠিক জবাব নেই।

যেহেতু উদ্ভিদে একাত্বতার ভিত্তি হল উদ্ভিজ্জ আত্মা, সেহেতু উদ্ভিজ্জ জীবন উপযুক্ত ব তেু বিশেষ উদ্ভিদীয় গঠন ও আত্মার অস্তিত্বের আওতায় থাকে। আর যখনই ব র এ উপযুক্ততা (বা গ্রহণক্ষমতা) বিলুপ্ত হয়, তখনই এ উদ্ভিদীয় গঠন ও আত্মারও বিস্মৃতি ঘটে। আবার যদি সেই ব পুনরায় নতুনভাবে উদ্ভিজ্জ গঠন গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করে, তবে তা নতুন এক উদ্ভিদীয় আত্মার অধিকারী হয়। কিন্তু পুরাতন ও নতুন উদ্ভিদের মধ্যে পরিপূর্ণ সাদৃশ্য থাকা সত্বেও, প্রকৃতার্থে এগুলো অভিন্ন নয় এবং সূক্ষ্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন উদ্ভিদকে, পূর্বোক্ত উদ্ভিদ রূপেই মনে করা যায় না।

তবে প্রাণী ও মানুষের নাফস বা আত্মা যেহেতু অব গত, সেহেতু দেহ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও অবশিষ্ট থাকতে পারে এবং পুনরায় যখন দেহের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তখন ঠিক সেই ব্যক্তির একত্বতা ও অভিন্নতাকে রক্ষা করতে সক্ষম, যেরূপে মৃত্যুর পূর্বেও রূহ বা আত্মার ভিত্তিতে এ ব্যক্তির একত্বতা ও অভিন্নতা বজায় ছিল এবং দৈহিক উপাদানের পরিবর্তন ব্যক্তির বিভিন্নতার কারণ হয়নি। কিন্তু যদি কেউ প্রাণী ও মানুষের অস্তিত্বকে ধুমাত্র এ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেহে ও দৈহিক বৈশিষ্ট্যের । মধ্যেই সীমাব বলে মনে করে থাকেন এবং রূহকেও কোন এক বা সমষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের ফল বলে গণনা করে থাকেন, এমনকি একে অস্পৃশ্য গঠন মনে করলে ও ব গত বলে গণনা করেন, যা এর অঙ্গ- প্রতঙ্গের বিলুপ্তির সাথে সাথে বিনষ্ট হয়, তবে এ ধরনের ব্যক্তির পক্ষে পুনরুত্থানের সঠিক ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়। কারণ যদি ধারণা করা হয় যে, দেহ জীবনের জন্যে নতুনভাবে উপযুক্ততা অর্জন করেছে, তবে তাতে নতুন বৈশিষ্ট্য ও গুণের আবির্ভাব ঘটে। ফলে একাত্বতার বা অভিন্নতার (এটা তা- ই) আর কোন প্রকৃত ভিত্তির অস্তিত্ব থাকে না। কারণ ধারণা করা হয়েছে যে, পূর্বতন সকল বৈশিষ্ট্যই সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়েছে এবং নতুন বৈশিষ্ট্যসমূহ রূপ লাভ করেছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সি ান্তে পৌঁছতে পারি যে, একমাত্র তখনই মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে সঠিক রূপে অনুধাবন করা যাবে, যখন রূহকে দেহ ও দৈহিক বৈশিষ্ট্য ভিন্ন অন্য কোন

বিষয় বলে মনে করা হবে। এমনকি একে ব   গঠন, যা দেহে অনুপ্রবেশ করেছে এবং দেহের অবস্থানের সাথে সাথে বিনষ্ট হয়ে যায় তা- ও মনে করা যাবে না।

অতএব সর্বপথমে রূহের (روح) অস্তিত্বকে স্বীকার করতে হবে। দ্বিতীয়ত : রূহকে এক সত্ত্বাগত বিষয় (Essence) বলে মনে করতে হবে, দেহ সমন্ধীয় বলে মনে করা যাবে না। তৃতীয়তঃ দেহ বিনষ্ট হওয়ার পরও একে স্বাধীন ও অবশিষ্ট থাকার যোগ্য বলে মনে করতে হবে ; অনুপ্রবেশকার্রী গঠনের মত নয় (পারিভাষিক অর্থে ব তে সমাপতিত হওয়া) যে, দেহ বিনষ্ট হওয়ার সাথে সাথে বিনষ্ট হয়ে যাবে ।

মানুষের অস্তিত্বে আত্মার অবস্থান :

অপর একটি বিষয় যা এখানে স্মরণ করব তা হল এই যে, দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে মানুষের গঠন দু'টি মৌলের সমন্বয়ে গঠিত অন্যান্য রাসায়নিক যৌগের মত নয়। উদাহরণতঃ অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে পানি গঠিত হয়, যাদের পারস্পরিক বিভাজনের ফলে একটি 'সমগ্র ' হিসাবে ঐ যৌগের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু রূহ বা আত্মা হল মানুষের মূলসত্তা এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তা বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ মনুষ্যত্ব এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সংরক্ষিত থাকবে। আর এ কারণেই দেহের কোষসমূহের পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তির একত্বতার বা অভিন্নতার কোন ক্ষতি হয় না। কারণ মানুষের প্রকৃত একত্বতার ভিত্তি হল, তার সেই আত্মার একত্ব ।

পবিত্র কোরান এ বাস্তবতার প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে,   পুনরুত্থান বা মাআদের অস্বীকারকারী যারা বলত : "মানুষের অঙ্গ- প্রত্যঙ্গসমূহ বিধ্বস্ত হওয়ার পর কিরূপে তার পক্ষে নতুন জীবনলাভ সম্ভব?" তাদের জবাবে বলে :

(قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ)

বলুন (তোমরা বিলুপ্ত হবেনা বরং) তোমাদের জন্যে নিযুক্ত মৃত্যুর ফেরেস্তা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। (সূরা সিজদাহ- ১১)

অতএব প্রত্যেকেরই মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্বের ভিত্তি হল তা- ই,   যা মৃত্যুর ফেরেস্তা কব্জা বা হরণ করেন;   দৈহিক অঙ্গ- প্রত্যঙ্গে নয় যেগুলো মাটির সাথে মিশে যায়।

৩য় পাঠ

আত্মার বিমূর্তনতা

ভূমিক :

ইতিমধ্যেই আমরা জেনেছি যে, মাআদ বা পুনরুত্থানের বিষয়টি আত্মার সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ কেবলমাত্র তখনই বলা যাবে যে, 'মৃত্যুর পর যিনি (পুনরায়) জীবিত হয়ে থাকবেন, তিনি সেই পূর্বের ব্যক্তিই'যখন তার আত্মা, তার দেহ বিনষ্ট হয়ে যাবার পরও অবশিষ্ট থাকবে। অন্যভাবে বলা যায় : সকল মানুষই, ব গতদেহ ছাড়া ও এক অব গত সত্বার অধিকারী, যা দেহ থেকে স্বাধীন হওয়ার যোগ্যতা রাখে এবং তার মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্বও এর উপর নির্ভরশীল। নতুবা ঐ ব্যক্তির জন্যে নতুন কোন জীবনের ধারণা বুি বৃত্তিকভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

অতএব পুনরুত্থান ও এতদসম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ের উপর আলোচনা করার পূর্বে এ বিষয়টিকে প্রতিপাদন করতে হবে। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকেই এ পাঠে আমরা কেবলমাত্র এ বিষয়টির উপরই আলোকপাত করব এবং একে প্রমাণের জন্যে দু'ধরনের যুক্তির অবতারণা করব : একটি হল বুি বৃত্তিক এবং অপরটি হল ওহীর মাধ্যমে'।[৯]

আত্মার বিমূর্তনতার স্বপক্ষে বুি বৃত্তিক দলিলসমূহ :

প্রাচীনকাল থেকেই দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণ রূহ (روح) বা আত্মা (দর্শনের পরিভাষায় যাকে নাফস বলা হয়[১০]) সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে ইসলামী দার্শনিকগণ এ বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন এবং তাদের দর্শন সম্পর্কিত পুস্তকসমূহের বিশেষ অংশ জুড়ে এ বিষয়টি স্থান পেলেও, তারা এ বিষয়টির শিরোনামে পৃথক পৃথক পুস্তক- পুস্তিকাও লিখেছিলেন। আর সেই সাথে যারা রূহকে দৈহিক সংঘটনসমূহের (Accidents) মধ্যে একটি

সংঘটন (Accident) বলে মনে করেন অথবা ব গত গঠন (দৈহিক উপাদানের অনুসারী) বলে গণনা করেন, তাদের বক্তব্যকে একাধিক যুক্তির মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

স্পষ্টতঃই এ ধরনের বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা এ পুস্তক সংশ্লিষ্ট নয়। ফলে এ বিষয়টির উপর কিছুটা আলোকপাত করেই তুষ্ট থাকব। আর চেষ্টা করব এ বিষয়ের উপর সুস্পষ্ট ও একই সাথে সুদঢ় বক্তব্য উপস্থাপন করতে। একাধিক বু বৃত্তিক দলিলের সমন্বয়ে এ বক্তব্যটির উপস্থাপন নিম্নলিখিত ভূমিকার মাধ্যমে সূচনা করব :

আমরা আমাদের নিজ নিজ চর্মের রং ও দেহের গঠনকে সচক্ষে পর্যবেক্ষণ করি এবং বিভিন্ন অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের কোমলতা ও কর্কশতাকে স্পর্শেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করতে পারি। আমাদের দেহাভ্যন্তরস্থ অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে পরোক্ষভাবে অবহিত হতে পারি। কিন্তু ভয়- ভীতি, অনুগ্রহ ক্রোধ, ইচ্ছা ও আমাদের চিন্তাকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীতই অনুধাবন করে থাকি। অনুরূপ যে 'আমা' হতে এ অনুভব, অনুভূতির মত মানসিক অবস্থা প্রকাশ পায়, তাকেও কোন প্রকার ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকেই উপলব্ধি করতে পারি।

সুতরাং মানুষ দু'প্রকার অনুভূতির অধিকারী : এক প্রকারের অনুভূতি হল, যার জন্যে ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করতে হয় এবং অপর শ্রেণী হল, যার জন্যে ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয় না।

অপর একটি বিষয় হল : ইন্দ্রিয়ানুভূতি যে, বিভিন্ন প্রকার ভুল- ভ্রান্তিতে পতিত হয় তার আলোকে বলা যায়, প্রাগুক্ত প্রথম শ্রেণীর অনুভূতি, দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুভূতির ব্যতিক্রমে ত্রুটি- বিচ্যুতিতে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুভূতিতে ভুল- ত্রুটি ও দ্বিধা- দ্বন্দ্বের কোন অবকাশ থাকে না। যেমন : কেউ হয়ত সন্দেহ করতে পারে যে, তার চামড়ার রং যে রকম দেখছে ঠিক সেরকমটি কি না। কিন্তু কেউই সন্দেহ করতে পারে না যে, সে কোন চিন্তা করে কি না, সি ান্ত নিয়েছে কি না, সন্দেহ করছে কি না ।

আর এ বিষয়টিই দর্শনে এ ভাবে বর্ণিত হয় যে, স্বজ্ঞাত সতঃলব্ধ জ্ঞান (Intuitive Knowledge) প্রত্যক্ষভাবে স্বয়ং বাস্তবতার সাথে সমন্ধ স্থাপন করে। ফলে ত্রুটি- বিচ্যুতির কোন সুযোগ থাকে

না। কিন্তু অভিজ্ঞতালব্ধ বা অর্জিত জ্ঞান (Empirical Knowledge) অনুভূতিক গঠনের (Form) মাধ্যমে অর্জিত হয়। ফলে স্বভাবতঃই সন্দেহ ও দ্বিধা- দ্বন্দ্বের অবকাশ থাকে।

অর্থাৎ মানুষের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য জ্ঞান হল স্বজ্ঞাত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান, যা নাফস বা আত্মার জ্ঞান, আবেগ, অনুভূতি ও অন্যান্য সকল মানসিক অবস্থাকে সমন্বিত করে । অতএব উপলব্ধি ও চিন্তার ধারক ও সি ান্ত গ্রহণকারী এ 'আমা'র অস্তিত্বে কখনোই দ্বিধা- দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না - যেমনিকরে ভয়, অনুগ্রহ, ক্রোধ, চিন্তা ও ইচ্ছার অস্তিত্বে কোন দ্বিধা- দ্বন্দ্বের অবকাশ থাকে না।

এখন প্রশ্ন হল : এই 'আমা' কি সেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ব গত দেহ এবং মানসিক অবস্থা কি দেহ সংঘটিত; নাকি তাদের অস্তিত্ব দেহ ভিন্ন অন্য কিছু - যদিও 'আমা'দেহের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত এবং নিজের অনেক কর্মই দেহের মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকে; এছাড়া দেহ কর্তৃক প্রভাবিত হয় ও দেহকে প্রভাবিত করে ?

উল্লেখিত ভূমিকাটির আলোকে এর জবাব খুব সহজেই আমরা পেতে পারি। কারণ :

প্রথমত : 'আমা' কে স্বজ্ঞাত জ্ঞানে উপলব্ধি করব; কিন্তু দেহকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে চিনতে হবে। অতএব 'আমা' (নাফস ও রূহ) দেহ ভিন্ন অন্য বিষয়।

দ্বিতীয়ত : 'আমা' এমন এক অস্তিত্ব, যা যুগযুগান্তরে একত্বতার বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃত ব্যক্তিত্বসহ অবশিষ্ট থাকে এবং এ একত্বতা ও ব্যক্তিত্বকে আমরা ভুল- ত্রুটি বিবর্জিত স্বজ্ঞাত জ্ঞানের মাধ্যমে খুজে পাই। অথচ দেহের অঙ্গ- প্রত্যঙ্গসমূহ অসংখ্যবার পরিবর্তিত হয় এবং পূর্ববর্তী ও উত্তরবর্তী অংশের একত্ব ও অভিন্নতার (এটা তা- ই) জন্যে কোন প্রকার প্রকৃত ভিত্তিরই অস্তিত্ব নেই।

তৃতীয়ত : 'আমা' এক সরল (بسيط) ও অবিভাজ্য অস্তিত্ব।

উদাহরণতঃ একে দু'অর্ধ 'আমা'তে বিভক্ত করা সম্ভব নয়। অথচ দেহের অঙ্গসমূহ বিবিধ এবং বিভাজনোপযোগী।

চতুর্থত : কোন মানসিক অবস্থাই যেমন : অনুভূতি ইচ্ছা ইত্যাদি ব গত বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ বিস্তৃতি ও বিভাজন ইত্যাদির অধিকারী নয়। আর এ ধরনের কোন অব গত বিষয়কে ব (দেহ) সংঘটন বলে গণনা করা যায় না। অতএব এ সংঘটনের বিষয় (موضوع) হল অব গত সত্তা (مجرد)।

রূহের অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা এবং মৃত্যুর পরও এর অবশিষ্ট থাকার স্বপক্ষে নির্ভরযোগ্য ও মনোহর যুক্তিসমূহের মধ্যে একটি হল সত্য স্বপ্নসমূহ, যার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের মৃত্যুর পর সঠিক সংবাদসমূহ স্বপ্নদর্শনকারীর নিকট পৌঁছিয়েছেন। অনুরূপ আত্মাসমূহকে ডেকে পাঠানো, যা চূড়ান্ত ও উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তসমূহ সহকারে একথার স্বপক্ষেই দলিল উপস্থাপন করে। এছাড়া আল্লাহর ওলীগণের কেরামত, এমনকি যোগীদের কোন কোন কর্মের কথাও আত্মা ও এর বিমূততার প্রমাণসরূ উল্লেখ করা যেতে পারে। এ বিষয়ের উপর লিখিত পৃথক পৃথক পুস্তক রয়েছে।

কোরান থেকে দলিলাদি :

কোরানের ভাষায় মানুষের আত্মা সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই যে, রূহ অসীম মর্যাদার প্রান্ত থেকে মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত হয়। যেমনটি মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে :

(وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ)

এবং তাতে রূহ ফুকে দিয়েছেন তার নিকট হতে। (সূরা সেজদা- ৯)

অর্থাৎ দেহ গঠন করার পর নিজের (আল্লাহর) সাথে সম্পর্কিত রূহ তাতে প্রদান করলেন, খোদার জাত (ذات) থেকে নয়, যার ফলে খোদা মানুষে স্থান্তরিত হবেন (মহান আল্লাহ আমাদেরকে এ ধরনের চিন্তা থেকে রক্ষা করুন)।

অনুরূপ হযরত আদমের (আ.) সৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়েছে :

(وَنَفَخت فِيهِ مِن رُّوحِهِ)

এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করলাম। (হিজর - ২৯) এবং (সাদ- ৭২)

এছাড়া অপর কিছু আয়াত থেকে আমরা দেখতে পাই যে, রূহ দেহ বা দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও সংঘটন ব্যতীত অন্য বিষয় এবং তা দেহ ব্যতীতই অবশিষ্ট থাকার যোগ্যতা রাখে। যেমন : কাফেরদের বক্তব্য উল্লেখ করতে গিয়ে বলাহয় যে, তারা বলত :

(إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ)

আমরা (মৃত্যু বরণ এবং) মৃত্তিকায় পর্যবসিত হলেও এবং আমাদের শরীরের অঙ্গ- প্রতঙ্গ মৃত্তিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লেও কি আমাদেরকে আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে? (সেজদা- ১০)

মহান আল্লাহ জবাব দিলেন :

(قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ)

বল, (তোমরা নিখোঁজ হবে না বরং) তোমাদের জন্যে নিযুক্ত মৃত্যুর ফেরেস্তা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অবশেষে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। (সোজদা- ১১)

অতএব মানুষের স্বরূপের ভিত্তি মূলে রয়েছে তার আত্মা বা রূহ, যা মৃত্যুর ফেরেস্তা কর্তৃক হরণ করা ও সংরক্ষিত হয়ে থাকে; দেহের বিভিন্ন অংশ, যেগুলো বিধ্বস্ত ও মৃত্তিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে, তা নয়।

অপর এক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে :

(اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى)

আল্লাহই জীবসমূহের প্রাণ হরণ করেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। অতঃপর যার জন্যে মৃত্যুর সি ান্ত করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অপরগুলি এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ফিরিয়ে দেন। (সূরা যুমার - ৪২)

অত্যাচারীদের মৃত্যুর প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে :

(إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ)

যখন জালিমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে এবং ফেরেস্তাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ বের কর । (আনআম- ৯৩)

এ আয়াতসমূহ এবং অপর আয়াতসমূহ থেকে (সংক্ষিপ্ততা বজায় রাখার জন্যে, এ গুলোর উল্লেখ থেকে বিরত থাকছি) আমরা দেখতে পাই যে, প্রত্যেকেরই ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য এমন কিছুতে বিদ্যমান যা মহান আল্লাহ ও মৃত্যুর ফেরেস্তাগণ বা রূহ কব্জাকারী ফেরেস্তাগণ হরণ করে থাকেন এবং দেহের বিনাশের ফলে মানুষের ব্যক্তিত্বের একত্বতার ও রূহের বিদ্যমানতার কোন ক্ষতি করে না।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রিক্ষিতে আমরা এ সি ান্তে পৌঁছতে পারি যে, প্রথমতঃ মানুষে রূহ (روح) ও আত্মা নামক কিছু বিদ্যমান। দ্বিতীয়তঃ মানুষের আত্মা অবশিষ্ট থাকার ও দেহ থেকে স্বাধীন হওয়ার যোগ্যতা রাখে, ব সংঘটন ও ব গত গঠনের (صور مادّی) মত অবস্থানের বিলুপ্তির সাথে সাথে বিনাশ হয়ে যায় না। তৃতীয়তঃ সকলের স্বরূপ ও স্বাতন্ত্রিকতা তার আত্মার উপর নির্ভরশীল। অন্যকথায় : প্রত্যেক মানুষেরই বাস্তবতা বা প্রকৃত অবস্থা হল, তার আত্মায় এবং দেহ সেখানে আত্মার অধীনে সরঞ্জামের ভূমিকা রাখে মাত্র।

৪র্থ পাঠ

মাআদ বা পুনরুত্থানের প্রতিপাদন

ভূমিকা :

এ পুস্তকের প্রারম্ভেই আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে, পুনরুত্থানে বিশ্বাস ও পরকালীন জগতে প্রত্যেক মানুষের জীবনলাভের বিশ্বাস, প্রতিটি ঐশী ধর্মেরই মৌলিকতম বিশ্বাসসমূহের অন্যতম। আল্লাহ্ প্রেরিত পুরুষগণ এ বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন এবং মানুষের হৃদয়ে এর বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করার জন্যে অপরিসীম শ্রম ব্যয় করেছিলেন।

পবিত্র কোরানে পুনরুত্থান (معاد) ন্যায়পরায়ণতা (عدل) ও একক খোদার প্রতি বিশ্বাস সমান গুরুত্ব পেয়েছে এবং বিশটিরও অধিক সংখ্যক আয়াতে (আল্লাহ) ও اليوم الاخر(ওয়াল ইয়াওমূল আখির) একইসাথে ব্যবহার করা হয়েছে (পরকালীন জীবন সম্পর্কে বর্ণিত যে দু'সহস্রাধিক আয়াত এসেছে তা ব্যতীত)।

এ খণ্ডের রুতেই বিচার দিবসের পরিচিতির উপর গবেষণার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম এবং ব্যাখ্যা করেছিলাম যে, পুনরুত্থানের সঠিক ধারণা, আত্মা বা রূহকে স্বীকার করার উপর নির্ভরশীল, যা প্রত্যেক মানুষেরই স্বরূপের ভিত্তি এবং যা মৃত্যুর পরও অবশিষ্ট থাকে, যার ফলে বলা যায় : যে ব্যক্তি পরলোকগমণ করে, ঠিক সে ব্যক্তিই পুনরায় পরকালে জীবন লাভ করবে। অতঃপর এ ধরনের রূহ বা আত্মার অস্তিত্বকে বুি বৃত্তিক ও ওহীভিত্তিক দলিলের মাধ্যমে প্রমাণ করেছি, যাতে 'মানুষের অনন্ত জীবন' শীর্ষক মূল আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তত হয়। এখন এ গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়টির প্রতিপাদনের পালা এসেছে।

রূহ বা আত্মার বিষয়টি যেরূপ দু'ভাবে (বুি বৃত্তিক ও ওহী) প্রমাণিত হয়েছে সেরূপ এ বিষয়টিও দু'ভাবেই প্রতিপাদনযোগ্য। আমরা এখানে পুনরুত্থানের প্রয়োজনীয়তার উপর দু'টি

বু বৃত্তিক দলিল উপস্থাপন করব। অতঃপর পুনরুত্থানের সম্ভাবনা ও প্রয়োজনীয়তার উপর পবিত্র কোরানের বক্তব্যের কিছু অংশ তুলে ধরব।

প্রজ্ঞাভিত্তিক দলিল :

খোদা পরিচিতি খণ্ডে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে, প্রভুর সৃষ্টি উদ্দেশ্যহীন ও অনর্থক নয়, বরং কল্যাণ ও পূর্ণতার প্রতি যে অনুরাগ প্রভুর সত্তায় (ذات) বিদ্যমান। মূলতঃ স্বয়ং সত্তায় এবং অনুবর্তনক্রমে এর প্রভাব, যা কল্যাণ ও পূর্ণতার একাধিক স্তরবিশিষ্ট, তার সাথে সম্পর্কযুক্ত। ফলে তিনি এ বিশ্বকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, যথাসম্ভব সর্বাধিক পূর্ণতা ও কল্যাণ তাতে অর্জিত হয়। আর এ কারণেই আমরা মহান প্রভুর প্রজ্ঞা বা হিকমত নামক গুণটি প্রমাণ করেছি, যার দাবী হল সৃষ্ট বিষয়সমূহকে তাদের চূড়ান্ত ও যথোপযুক্ত উৎকর্ষে পৌঁছানো। কিন্তু ব গত বিশ্বে রয়েছে বিভিন্ন অসামঞ্জস্যতা এবং ব গত অস্তিত্বসমূহের কল্যাণ ও পূর্ণতার ক্ষেত্রে বিদ্যমান পারস্পরিক বিরোধ। প্রজ্ঞাময় প্রভুর পরিচালনায় সৃষ্ট বিষয়াদি এরূপে বিন্যাসিত হয়েছে যে, সামগ্রিকভাবে ঐগুলো সর্বাধিক কল্যাণ ও পূর্ণতার অধিকারী হতে পারে। অন্যকথায় : বিশ্ব সুশৃংখলিত বিন্যাস ব্যবস্থার অধিকারী হতে পারে। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকেই বিভিন্ন উপাদান ও এগুলোর সংখ্যা, গুণ, ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও গতি এমনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে যে, প্রাণী ও উদ্ভিদরাজি সৃষ্টির ক্ষেত্র এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মানুষ (যা এ বিশ্বের পূর্ণতম অস্তিত্ব) সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। অপরদিকে যদি এ বিশ্বকে এরূপে সৃজন করা হত যে, জীবিত অস্তিত্বসমূহের সৃষ্টি ও উৎকর্ষ অসম্ভব হয়ে পড়ত, তবে তা প্রভুর প্রজ্ঞার পরিপন্থী হত।

এখন আমরা বলব : মানুষ অমর আত্মার অধিকারী এবং সে এমন অনন্ত ও চিরন্তন পূর্ণতা বা কামালতের অধিকারী হতে সক্ষম যে, তা অস্তিত্বগত মর্যাদা ও মূল্যবোধের দিক থেকে ব গত পূর্ণতার সাথে অতুলনীয়। যদি মানুষের জীবন কেবলমাত্র এ পার্থিব জীবনের মধ্যেই সীমাব হয়, তবে তা স্রষ্টার প্রজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না। বিশেষকরে তা এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, পার্থিব জীবন অপরিসীম শ্রান্তি, দুর্ভোগ ও দুর্যোগপূর্ণ এবং অধিকাংশ সময়ই দুর্ভোগ ও দুঃখ- দুর্দশা ভোগ ব্যতীত কোন কিছুর সাধ ও আনন্দ উপভোগ করা সম্ভব হয় না; যেমনিকরে

হিসাবী ব্যক্তিদেরকে এ সি ান্তে পৌঁছায় যে, এ সীমাব সুখের বিনিময়ে এ সমস্ত কষ্ট ও ক্লেশ ভোগের মূল্যায়ন হয় না। আর এ ধরনের হিসাবের ফলেই জীবনের ব্যর্থতা ও নিরর্থকতা অনুভূত হয়। এমনকি কেউ কেউ পার্থিব জীবনের প্রতি স্বভাবজাত আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। প্রকৃতই যদি মানুষের জীবনে অনবরত কষ্ট ও শ্রম ব্যতীত কিছুই না থাকত এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক সমস্যার সাথে প্রতিনিয়ত সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়, যাতে এক মুহূর্ত আনন্দ ও সম্ভোগ পেতে পারে; অতঃপর সীমাহীন শ্রান্তিতে নিদ্রায় ঢলে পড়বে, যাতে নবোদ্যমে কর্ম সম্পাদনের জন্যে শরীর প্রস্তত হতে পারে; আর এ ভাবে নিত্য নতুন কর্ম সম্পাদন করবে, যাতে এক চিলতে রুটি উপার্জন করতে পারে এবং কিঞ্চিৎকাল সে রুটির স্বাদ আসস্বাদন করতে পারে এবং অতঃপর কিছুই না ! তবে এ ধরনের ক্ষতিকর ও বিষাদময় ধারাবাহিকতাকে বু বৃত্তি গ্রহণ করত না বা মনোনীত করত না। এ ধরনের জীবনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল : সেই গাড়ী চালকের মত, যে তার গাড়ীকে পেট্রোল পাম্পের নিকট পৌঁছাতে ও পেট্রোল ভর্তি করতে চেষ্টারত, অতঃপর এ পেট্রোল খরচ করে অন্য এক পেট্রোল পাম্পের নিকট পৌঁছাবে এবং এ প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার গাড়ীটি অক্ষম ও বিনষ্ট হবে অথবা অন্য কোন গাড়ী বা প্রতিবন্ধকের সাথে সংঘর্ষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে !

স্পষ্টতঃই এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির যুক্তিগত ফল মানুষের জীবনের অন্তঃসার ন্যতা বৈ কিছু নয়।

অপরদিকে মানুষের একটি সহজাত প্রবণতা হল অমর ও চিরস্থায়ী থাকার বাসনা। যা মহান প্রভুর উদারহস্ত তার প্রকৃতিতে (فطرت) গচ্ছিত রেখেছে এবং যা সেই বর্ধিত গতিশক্তির অধিকারী, যে গতিশক্তি তাকে অনন্তের দিকে ধাবিত করে ও সর্বদা এ গতির ক্ষিপ্রতা প্রদান করে। এখন যদি মনে করা হয় যে, এ ধরনের গতির শেষফল ক্ষিপ্রতার চূড়ান্ত পর্যায়ে কোন এক প্রস্তর খণ্ডের সাথে সংঘর্ষ ঘটা ও বিধ্বস্ত হওয়া ব্যতীত কিছু নয়, তবে কি এ ধরনের বর্ধিত শক্তির অস্তিত্ব, প্রাগুক্ত ফলশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে ?

অতএব বর্ণিত সহজাত প্রবণতা একমাত্র তখনই প্রভুর প্রজ্ঞার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে, যখন এ জীবন ছাড়াও মরণোত্তর অপর এক জীবন তার অপেক্ষায় থাকবে।

উপরোল্লিখিত দু'টি ভূমিকার সমন্বয়ে (অর্থাৎ প্রভুর প্রজ্ঞা এবং মানুষের জন্যে অনন্ত জীবনের সম্ভাবনা) আমরা এ সি ান্তে পৌঁছতে পারি যে, পার্থিব এ সীমাব জীবনের পরে, অপর এক জীবনের অস্তিত্ব থাকা আবশ্যক, যাতে প্রভুর প্রজ্ঞার পরিপন্থী না হয়।

অনুরূপ অমরত্ব লাভের প্রবণতাকে অপর একটি ভূমিকারূপে গ্রহণ করতঃ প্রভুর প্রজ্ঞার সমন্বয়ে, একে অপর একটি দলিলরূপে বিবেচনা করা যেতে পারে।

প্রসঙ্গক্রমে এটাও সুস্পষ্ট হয়েছে যে, মানুষের অনন্ত জীবন অপর এমন এক নিয়মের অধীন হতে হবে। যেখানে পার্থিব জীবনের মত (সুখ- শান্তি) কষ্ট ও শ্রান্তি মিশ্রিত হবে না। নতুবা পার্থিব এ জীবনের পরিধি যদি অসীম পর্যন্তও বিস্তৃত হওয়া সম্ভব হয়, তবে তা প্রভুর প্রজ্ঞার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে না।

ন্যায়পরায়ণতাভিত্তিক দলিল :

এ পৃথিবীতে মানুষ সুকর্ম ও কুকর্ম নির্বাচন ও সম্পাদনের ক্ষেত্রে স্বাধীন : একদিকে এমন কিছু মানুষ আছে, যারা সর্বদা আল্লাহর উপাসনায় ও তার সৃষ্টির কল্যাণে নিজ জীবন উৎসর্গ করেন। অপরদিকে এমন কিছু দুস্কৃতকারী আছে, যারা তাদের শয়তানী কুপ্রবৃত্তিরর চাহিদা মিটাতে নিকৃষ্টতম ও জঘন্যতম অপরাধে লিপ্ত হয়। মূলতঃ এ বিশ্বে মানুষের সৃষ্টি, একাধিক প্রবৃত্তি ও প্রবণতায় এবং ইচ্ছাশক্তি ও নির্বাচনে তাকে সুসজ্জিতকরণ, বুি বৃত্তিক ও উ ৃতিগত জ্ঞানের আলোকে তাকে সন্নিবেশিতকরণ, তার জন্যে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র প্র তকরণ এবং তাকে সত্য ও মিথ্যা বা কল্যাণ ও অকল্যাণের দ্বিধাবিভক্ত পথে স্থাপনের উদ্দেশ্য হল, তাকে অসংখ্য পরীক্ষার সম্মুখীন করা। আর এ ভাবে সে স্বীয় উৎকর্ষের পথকে নিজ ইচ্ছায় নির্বাচন করতঃ নিজ ইচ্ছাধীন কর্মের ফল বা পুরস্কার ও শাস্তি প্রাপ্ত হবে। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে মানুষের জন্যে সর্বদাই রয়েছে পরীক্ষা এবং পৃথিবী হল তার স্বরূপের প্রস্ফুটন ও আত্মগঠনের সময়। এমনকি (এ পার্থিব) জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত সে এ পরীক্ষা ও দায়িত্ব পালন থেকে মুক্ত নয়।

কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, এ বিশ্বে সুকর্ম ও দুষ্কর্ম সম্পাদনকারী নিজ নিজ কর্মের পুরস্কার ও শাস্তি ভোগ করে না। বরং দুস্কৃতকারী অধিক বৈভবের অধিকারী ছিল এবং আছে। মূলতঃ পার্থিব জীবন অধিকাংশ কর্মেরই পুরস্কার বা শাস্তি লাভের অযোগ্য, যেমনঃ যে ব্যক্তি শতসহস্র মানুষকে হত্যা করেছে, তার উপর একাধিকবার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা সম্ভব নয় এবং নিঃসন্দেহে অপরসংখ্যক অত্যাচারের শাস্তি তাকে প্রদান করা সম্ভব হয়নি। অথচ প্রভুর ন্যায়পরায়ণতার[১১] দাবী হল, যে কেউ ন্যূনতম পরিমাণ সুকর্ম ও কুকর্ম সম্পাদন করবে, তাকে অবশ্যই এর ফল ভোগ করতে হবে।

অতএব এ ধরিত্রী যেমন মানুষের জন্যে কর্ম ও পরীক্ষাস্থল তেমনি অপর এক জীবনেরও অস্তিত্ব থাকা আবশ্যক। যেখানে সে তার কৃতকর্মের জন্যে পুরস্কার বা শাস্তি ভোগ করবে এবং প্রত্যেকেই তার যথোপযুক্ত প্রাপ্তি লাভ করবে। আর কেবল তখনই প্রভুর ন্যায়পরায়ণতা বাস্তব রূপ লাভ করবে।

প্রসঙ্গক্রমে উপরোক্ত আলোচনার আলোকে এটাও সুস্পষ্ট হয়েছে যে, পরকাল লক্ষ্যনির্বাচন ও কর্ম সম্পাদনের স্থান নয়। পরবর্তীতে এ প্রসঙ্গে অনেক বিষয়েরই আলোচনা আসবে।

৫ম পাঠ

পবিত্র কোরানে পুনরুত্থান দিবস

ভূমিকা :

পুনরুত্থানের স্বপক্ষে এবং একে প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ পবিত্র কোরানের উপস্থাপিত আয়াতসমূহকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা :

১। ঐ সকল আয়াত যেগুলোতে উল্লেখ করা যায় যে, মাআদ বা পুনরুত্থানের অস্বীকার করণের স্বপক্ষে কোন দলিল নেই। এ আয়াতসমূহ পুনরুত্থানের বিরুদ্ধবাদীদের নিরমস্ত্রীকরণ করে থাকে।

২। ঐ সকল আয়াত, যেগুলো পুনরুত্থানের অনুরূপ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে থাকে, যার ফলে এর অসম্ভাব্যতার ধারণা অপনোদিত হয়।

৩। ঐ সকল আয়াত, যেগুলো পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারীদের ভ্রান্ত ধারণাকে বর্জন করে এবং এর সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠা করে।

৪। ঐ সকল আয়াত, যেগুলো পুনরুত্থানকে প্রভুর এক আবশ্যকীয় ও অনিবার্য প্রতিশ্রুতিরূপে উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে পুনরুত্থানের সংঘটনকে সত্য সংবাদবাহকের সংবাদের মাধ্যমে প্রমাণ করা হয়ে থাকে।

৫। ঐ সকল আয়াত, যেগুলোতে পুনরথানের আবশ্যকতার স্বপক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মূলত : প্রথম তিন শ্রেণী হল পূনরুত্থানের সম্ভাবনা সম্পর্কিত এবং অবশিষ্ট দু' শ্রেণী হল এর সংঘটনের আবশ্যকীয়তা সম্পর্কিত।

পুনরুত্থানকে অস্বীকার করা অযৌক্তিক :

কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের বিরুে কোরানের যুক্তি প্রদর্শনের একটি প তি হল, তাদেরকে তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শনের আহ্বান জানানো। যাতে প্রমাণিত হয় যে, তাদের বিশ্বাসের কোন যৌক্তিক ভিত্তি নেই। যেমন : কয়েকটি আয়াতে এসেছে :

(قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ)

(হে নবী) বল, তোমাদের দলিল উপস্থাপন কর। (সূরা বাকারা- ১১১, সূরা আম্বিয়া- ২৪, নামল- ৬৪)

এ ধরনেরই অপর কিছু ঘটনার ক্ষেত্রে এ ভাবে বলা হয়েছে যে, এ ভ্রান্ত ধারণা পোষণকারীদের কোন বাস্তব জ্ঞান ও বিশ্বাস বা যুক্তি নেই। বরং তারা অযৌক্তিক ও অবাস্তব ধারণা ও কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছে।[১২]

পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে পবিত্র কোরানের বক্তব্য :

(وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ)

তারা বলে, 'একমাত্র পার্থিব জীবন ব্যতীত আমাদেরকে এমন কোন জীবন নেই যে, আমরা মৃত্যুবরণ করব ও জীবিত হব এবং কাল ব্যতীত কিছুই আমাদেরকে ধ্বংস করে না। ব তঃ এই ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা তো কেবলমাত্র মনগড়া কথা বলে। (জাসিয়া- ২৪)

অনুরূপ অপর কিছু আয়াতে এ বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে, পুনরুত্থানের অস্বীকৃতি অযৌক্তিক ও অনর্থক ধারণা বৈ কিছুই নয়।[১৩] তবে অযৌক্তিক ধারণাসমূহ যখন কুমন্ত্রণার অনুগামী হয়, তখন সম্ভবতঃ কুপ্রবৃত্তিরর অনুসারীদের নিকট তা সমাদৃত হয়ে থাকে[১৪] এবং এর ফলশ্রুতিতে পাপাচারে লিপ্ত হওয়া তাদের জন্যে নিশ্চিত রূপ লাভ করে।[১৫] এমনকি তখন ব্যক্তি এ ধরনের বিশ্বাসের উপর দৃঢ়তা প্রদর্শন করে।[১৬]

পবিত্র কোরানে, পুনরুত্থানকে প্রত্যাখ্যানকারীদের বক্তব্য উ ৃত হয়েছে। এ গুলোর অধিকাংশেরই মূলবক্তব্য, পুনরুত্থানকে অসম্ভব বলে মনেকরণ ব্যতীত কিছুই নেই। কিছু কিছু

আবার তাদের দূর্বল ধারণার প্রতি ইঙ্গিত করেছে, যেগুলো পুনরুত্থানের সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দেহ ও এর অসম্ভাব্যতার ধারণার উৎস ।[১৭] ফলে একদিকে যেমন পুনরুত্থানের সদৃশ ঘটনাসমূহকে স্মরণ করা হয়েছে, যাতে অসম্ভাব্যতার ধারণা বিদূরিত হয়।[১৮] অপরদিকে তেমনি ভ্রান্ত ধারণাগুলোর জবাব দেয়া হয়েছে, যাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ না থাকে এবং পুনরুত্থান সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা পরিপূর্ণরূপে প্রতিপাদিত হয়। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বরং 'প্রভুর এ প্রতিশ্রুতি অবশ্যম্ভাবী' এ কথা প্রমাণের পাশাপাশি, মানুষের জন্যে চূড়ান্ত দলিল উপস্থাপনের জন্যে ওহীর মাধ্যমে পুনরুত্থানের আবশ্যকতার উপর বুি বৃত্তিক দলিলের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরবর্তী পাঠে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হবে ।

পুনরুত্থানের সদৃশ ঘটনাবলী :

ক) **উদ্ভিদের উদগতিঃ** মৃত্যুর পর মানুষের জীবন লাভের ঘটনা, মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীতে শুষ্ক ও মৃত উদ্ভিদের উদগতির মত। ফলে মৃত্যুর পরে নিজেদের জীবন লাভের সম্ভাবনা অনুধাবনের জন্যে এ ঘটনার উপর চিন্তা করাই যথেষ্ট, যা সকল মানুষের চোখের সম্মুখে অহরহ ঘটে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনাটিকে একটি স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে করা এবং এর গুরুত্বকে বিস্মৃত হওয়ার যে কারণ তা হল, এ ঘটনাগুলোর পর্যবেক্ষণে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। নতুবা নতুন জীবন লাভের ক্ষেত্রে উদ্ভিদের সাথে মৃত্যুর পরে মানুষের জীবনলাভের কোন পার্থক্য নেই।

পবিত্র কোরানে এ নিত্য ঘটমান ঘটনাটির পর্যবেক্ষণের জন্যে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে ও মানুষের পুনরুত্থানকে এর সাথে তুলনা করা হয়েছে।[১৯] যেমন বলা হয়েছে :

(فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

আল্লাহর অনুগ্রহের ফলশ্রুতি সম্পর্কে চিন্তা কর, কিভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর এটাকে পূনর্জীবিত করেন; এ ভাবেই আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন, কারণ তিনি সর্ববিষয়ে

সর্বশক্তিমান। (রূম- ৫০)

খ) আসহাবে কাহফের নিদ্রা : পবিত্র কোরান অসংখ্য শিক্ষণীয় বিষয়সম্বলিত আসহাবে কাহফের বিস্ময়কর কাহিনী বর্ণনা করার পর বলে :

(وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا)

এবং এভাবে আমি মানুষকে তাদের (আসহাবে কাহফ) বিষয় জানিয়ে দিলাম যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামত যে সংঘটিত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। (কাহফ- ২১)

এ ধরনের বিস্ময়কর সংবাদ যে, মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তি কয়েকশতাব্দী (তিনশত সৌর বর্ষ বা তিনশত চন্দ্র বর্ষ) ধরে নিদ্রিত ছিলেন; অতঃপর জাগ্রত হয়েছেন, নিঃসন্দেহে তা পুনরুত্থানের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ ও এর অসম্ভাব্যতাকে দূরীভূত করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। কারণ প্রতিটি নিদ্রায়ই মৃত্যুসম (নিদ্রা মৃত্যুর ভাই) প্রতিটি জাগরনই মৃত্যু পরবর্তী জীবন সমতুল্য হলেও সাধারণ নিদ্রায় শরীরের জৈবিক (Biologic) প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই অব্যাহত থাকে; ফলে রূহের প্রত্যাবর্তন কোন আকস্মিক ঘটনা বলে মনে হয় না। কিন্তু যে শরীর তিনশত বছর ধরে কোন প্রকার খাদ্যোপাদান গ্রহণ করেনি প্রকৃতির প্রচলিত নিয়মানুসারে সে শরীর মৃত্যু বরণ করতঃ বিনষ্ট হতে বাধ্য এবং রূহের প্রত্যাবর্তনের জন্যে স্বীয় যোগ্যতা ও প্র তি হারাতে বাধ্য। অতএব এ ধরনের অলৌকিক ঘটনাই এ স্বাভাবিক নিয়মের উর্ধ্বে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম। ফলে মানুষ অনুধাবন করতে পারবে যে, দেহে রূহের প্রত্যাবর্তন সর্বদা এ সাধারণ ও প্রাকৃতিক নিয়মাধীন কারণ ও শর্তের মধ্যেই সীমাব নয়। অতএব মানুষের নব জীবনও যতই এ পৃথিবীর জীবন- মৃত্যুর ব্যতিক্রম হোক না কেন, তা কোন ভাবেই পরিত্যাজ্য নয়। বরং প্রভুর প্রতিশ্রুতি অনুসারে তা সংঘটিত হবেই।

গ) প্রাণীদের জীবন লাভ : পবিত্র কোরানে একইভাবে কয়েকটি প্রাণীর অসাধারণ ভাবে জীবন লাভের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আ.)- এর মাধ্যমে কয়েকটি পাখীর

জীবন লাভ[২০] এবং কোন এক নবীকে বহনকারী প র কাহিনী, (যার সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হবে) ইত্যাদির কথা উল্লেখযোগ্য। অতএব কোন প্রাণীর জীবিত হওয়া যদি সম্ভব হয় তবে মানুষের পক্ষেও জীবিত হওয়া অসম্ভব নয়।

ঘ) **এ পৃথিবীতেই কোন কোন মানুষের পুনর্জীবন লাভ** : এ প্রসঙ্গে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, এ পৃথিবীতেই কোন কোন মানুষের পুনর্জীবন লাভ করা। পবিত্র কোরানে এ ধরনের কিছু উদাহরণ উল্লেখ হয়েছে। যেমন : বনী ইসরাঈলের একজন নবীর ঘটনা যে, তার যাত্রাপথে কিছু মৃত মানুষের গলিত লাশ তার চোখে পড়ে। হঠাৎ তার ধারণা হল যে, কিরূপে এ মানুষগুলো পুনরায় জীবিত হবে। মহান আল্লাহ তার আত্মা ফিরিয়ে নিলেন এবং একশত বছর পর তাকে জীবিত করলেন। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : এ স্থানে তুমি কত সময় যাবৎ অবস্থান করছো ? তিনি যেন নিদ্রা থেকে জেগে উঠে ছিলেন ও বললেন : একদিন অথবা একদিনের কোন এক অংশ। প্রতি উত্তরে বলা হল : বরং তুমি একশত বছর এখানে অবস্থান করছো। অতএব লক্ষ্য কর একদিকে তোমার রুটি ও পানি সঠিকভাবে রক্ষিত, অপরদিকে তোমাকে বহনকারী প   পঁচে গলে গিয়েছে! এখন দেখ যে, আমরা কিরূপে এ প র হাড়গুলোকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করছি; পুনরায় এগুলোকে মাংস দ্বারা আবৃত করছি এবং একে জীবিত করছি।[২১]

অপর একটি কাহিনী হল এই যে, বনী ইসরাঈলের একদল লোক হযরত মূসাকে (আ.) বললঃ আমরা খোদাকে প্রকাশ্যে না দর্শন করা ব্যতীত কখনোই বিশ্বাস স্থাপন করব না। ফলে মহান আল্লাহ তাদেরকে বজ্রপাত দ্বারা ধ্বংস করলেন। অতঃপর হযরত মূসা (আ.)- এর অনুরোধে পুনরায় তাদেরকে জীবন দিলেন।[২২]

অনুরূপ বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির (যে মূসা (আ.)- এর সময় নিহত হয়েছিল) একটি জবাইকৃত গরুর দেহের কোন এক অংশের আঘাতে জীবিত হওয়ার কাহিনী উল্লেখযোগ্য, যা সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে এবং এর উপর ভিত্তি করেই সূরা বাকারার নামকরণ করা হয়েছে। এ কাহিনীর বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে :

(كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)

এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তার নিদর্শন তোমাদেরকে দেখিয়ে থাকেন, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার। (বাকারা- ৭৩)

এছাড়া ঈসা (আ.)[২৩] এর মু'জিযাহর ফলে কিছু মৃত ব্যক্তির জীবিত হওয়ার ঘটনাকেও পুনরুত্থানের সম্ভাবনার নিদর্শন বলে বর্ণনা করা যেতে পারে।

৬ষ্ঠ পাঠ

পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকারকারীদের প্রশ্নের জবাব

পবিত্র কোরান পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যে যুক্তি উপস্থাপন করেছে এবং যে ভাষায় তাদেরকে জবাব দিয়েছে, তা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, তাদের অন্তরে কিছু সন্দেহ ও দ্বিধা- দ্বন্দ্ব ছিল। জবাবের উপর ভিত্তি করে ঐগুলোকে আমরা নিম্নরূপে উল্লেখ করব। যথা :

১। বিলুপ্তির অস্তিত্ব লাভের ক্ষেত্রে অনুপপত্তি :

ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে, যারা বলত : "মানুষ তার দেহের বিগলনের পর পুনরায় কিরূপে জীবিত হতে সক্ষম?" তাদের মোকাবিলায় পবিত্র কোরান যে জবাব দেয়, তার বিষয়ব হল : তোমাদের স্বরূপের ভিত্তি হল তোমাদের রূহ, তোমাদের দেহের অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ নয়, যেগুলো ভূপৃষ্ঠে বিচ্ছিন্ন ও ছড়িয়ে পড়ে।[২৪]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা উদঘাটন করতে পারি যে, কাফেরদের এ অস্বীকৃতির উৎস হল তা, যা দর্শনের পরিভাষায় "বিলুপ্তের প্রত্যাবর্তন অসম্ভব" বলে পরিচিত। অর্থাৎ তারা দাবী করত যে, (রক্ত- মাংসে গড়া) এ দেহই হল মানুষ, যা মৃত্যুর মাধ্যমে ছিন্নভিন্ন ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং যদি নতুন করে জীবতও হয় তবে সে হবে অন্য এক মানুষ। কারণ যে অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গিয়েছে, তাকে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব এবং সত্তাগতভাবে তা সম্ভব নয়।

এ অনুপপত্তির জবাব : কোরানের উপরোল্লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক মানুষেরই স্বরূপ তার আত্মা বা রূহের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ পুনরুত্থানের অর্থ বিলুপ্তের প্রত্যাবর্তন নয়; বরং অস্তিত্বশীল রূহের প্রত্যাবর্তন।

২। নবজীবন লাভে দেহের অযোগ্যতা সম্পর্কিত অনুপপত্তি :

পুর্ববর্তী অনুপপত্তিটি ছিল পুনরুত্থানের সত্তাগত সম্ভাবনা ভিত্তিক। আর এ অনুপপত্তিটি প্রাগুক্ত সম্ভাবনাকে স্বীকার করে। অর্থাৎ বলে যে, যদিও দেহে রূহের প্রত্যাবর্তন বু বৃত্তিকভাবে অসম্ভব নয় এবং তা কল্পনা করার ক্ষেত্রে কোন প্রকার বিরোধ নেই; কিন্তু তা সংঘটনের ব্যাপারটি দেহের যোগ্যতার শর্তাধীন এবং আমরা দেখতে পাই যে, জীবনের অস্তিত্বলাভ, বিভিন্ন কারণ ও শর্তের সাথে সম্পর্ক যুক্ত যেগুলো সংগত কারণেই পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হয়। যেমন : ক্রাণুর জরায়ুতে অবস্থান গ্রহণ করা, এর বিকাশের জন্যে উপযুক্ত অবস্থার সমাহার, যাতে উত্তর উত্তর পূর্ণ ভ্রুণে পরিণত হয়ে পূর্ণ মানুষের রূপ লাভ করে। কিন্তু যে দেহ ছিন্ন- ভিন্ন ও ছড়িয়ে পড়েছে সে দেহের আর জীবন লাভের যোগ্যতা ও উপযুক্ততা থাকে না।

এর জবাব হল : এ দৃষ্ট পার্থিব নিয়মই, কেবলমাত্র সম্ভব নিয়ম নয় এবং অভিজ্ঞতার আলোকে যে সকল কারণ শনাক্ত করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যেই সকল কারণ সীমাব নয়। যার প্রমাণ এই যে, এ পৃথিবীতেই প্রাণী ও মানুষের জীবন লাভ সম্পর্কিত অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল।

এ জবাবটিকে আমরা পবিত্র কোরানে বর্ণিত এ ধরনের অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা থেকে পেতে পারি ।

৩। কর্তার ক্ষমতা সম্পর্কিত অনুপপত্তি :

অপর একটি অনুপপত্তি হল : কোন ঘটনার সংঘটনে সত্তাগত সম্ভাবনা ছাড়াও কর্তার যোগ্যতাকেও বিবেচনা করতে হবে। সুতরাং কোথা থেকে আমরা জানতে পারব যে, মহান আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন ?

এ ভিত্তিহীন ও উদ্ভট প্রশ্নটি তাদের পক্ষ থেকেই এসেছিল যারা মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতাকে অনুধাবন করতে পারেননি। এর জবাব হল : আল্লাহর ক্ষমতার কোন সীমা বা গণ্ডি নেই এবং তার ক্ষমতা সকল সম্ভাব্য ঘটনাকেই সমন্বিত করে। যেমন : কোন এক সময় অস্তিত্বহীন এ বিশ্বকে এ সমস্ত মহান কল্যাণের সমাহারে সৃষ্টি করেছেন।

(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

তারা কি অনুধাবন করে না যে, আল্লাহ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ সকলের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তিবোধ করেননি, তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম। ব তঃ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (আহকাফ- ৩৩)[২৫]

তাছাড়া নতুন করে সৃষ্টি করা, প্রথমবার সৃষ্টি করার চেয়ে জটিলতর নয় এবং এর জন্যে অধিকতর শক্তি ও ক্ষমতার প্রয়োজন হয় না। বরং বলা যেতে পারে অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ তাতো বিদ্যমান রূহের প্রত্যাবর্তন বৈ কিছুই নয়। তারা বলবে, কে আমাদেরকে পুনরুত্থিত করবে? বল, তিনিই যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তারা তোমার সম্মুখে মাথা নাড়াবে (এবং এ উত্তরে তারা বিস্মিত হবে)। (ইসরা- ৫১)[২৬]

(وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ)

তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তিনিই এটাকে সৃষ্টি করবেন পুর্নবার এবং ইহা তার জন্যে অতি সহজ। (রূম- ২৭)

৪। কর্তার জ্ঞান সম্পর্কিত অনুপপত্তি :

অপর একটি প্রশ্ন হল এই যে, যদি মহান আল্লাহ মানুষকে জীবন দিতে এবং তাদের কর্মের পুরস্কার ও শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেন তবে একদিকে যেমন তাকে অসংখ্য দেহসমষ্টির প্রত্যেকটি থেকে স্বতন্ত্ররূপে শনাক্ত করতে হবে, যাতে প্রতিটি আত্মাকে এর নিজস্ব দেহে প্রত্যাবর্তন করাতে পারেন; অপরদিকে তেমনি সকল ভাল ও মন্দ কর্মের হিসাব তার স্মরণে থাকতে হবে, যাতে নির্দিষ্ট কর্মের জন্যে নির্দিষ্ট পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করতে পারেন। তাহলে যে সকল দেহ মৃত্তিকায় পরিণত হয়েছে এবং যেগুলোর অনুসমূহ পরস্পর বিগলিত হয়েছে সেগুলোকে কিরূপে পুনঃশনাক্তকরণ সম্ভব ? আর কিরূপেই বা শত- সহস্র, এমনকি লক্ষ- কোটি বছর ধরে সকল মানুষের আচার- আচরণকে সুচারুরূপে ধারণ ও সংরক্ষণ করা সম্ভব ?

এ প্রশ্নটিও তাদের পক্ষ থেকেই বর্ণনা করা হয়েছে, যারা প্রভুর অসীম জ্ঞানকে উপলব্ধি করতে পারেনি এবং একে তাদের নিজেদের সীমাব ও অপূর্ণ জ্ঞানের সাথে তুলনা করেছেন।

আর এর জবাব হল : মহান আল্লাহর জ্ঞানের কোন সীমা নেই এবং সব কিছুই তার জ্ঞানের অধীন। আর মহান আল্লাহ কখনোই কোন কিছুকে বিস্মৃত হন না।

পবিত্র কোরানে ফেরাউনের বক্তব্যের উ ৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, সে মুসাকে (আ.) বলেছিল :

(فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ)

তা'হলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কী হবে? (যদি মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে জীবিত করে থাকবেন ও আমাদের হিসাব নিয়ে থাকবেন) (তোহা- ৫১)

হযরত : মুসা (আ.) বললেন :

(قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى)

বললেন : এর জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট লিপিব   আছে, আমার প্রতিপালক ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না। (তোহা- ৫২)

অপর একটি আয়াতে শেষোক্ত দু'টি অনুপপত্তির জবাব এভাবে বর্ণিত হয়েছে : বল, তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই, যিনি এটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। (ইয়াসীন- ৭৯)

৭ম পাঠ

ক্বিয়ামত সম্পর্কে প্রভুর প্রতিশ্রুতি

ভূমিকা :

পবিত্র কোরান একদিকে পুনরুত্থান সম্পর্কে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের নিকট সংবাদরূপে যা প্রেরিত হয়েছে তার উপর গুরুত্বারোপ করেছে এবং একে প্রভুর নিশ্চিত ও অলংঘনীয় প্রতিশ্রুতি বলে গণনা করেছে। আর পবিত্র কোরান এভাবে মানুষের জন্যে চূড়ান্ত দলিল সম্পন্ন করে থাকে। অপরদিকে পুনরুত্থানের আবশ্যকতার উপর বুদ্ধি বৃত্তিক যুক্তি প্রদর্শন করে, যাতে বুদ্ধি বৃত্তিক পরিচিতির পক্ষে মানুষের আকাংখা পূর্ণ হয় এবং দলিল শক্তিশালী হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে পুনরুত্থানের প্রমাণের ক্ষেত্রে কোরানের বক্তব্যকে আমরা দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করব এবং প্রতিটি শ্রেণীর জন্যে সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ থেকে উদাহরণ তুলে ধরব।

প্রভুর অনিবার্য প্রতিশ্রুতি :

পবিত্র কোরান, ক্বিয়ামতের সংঘটন ও পরকালে সকল মানুষের পূনর্জীবন লাভের ঘটনাকে একটি সুনিশ্চিত ঘটনা বলে উপস্থাপন করেছে :

(إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ)

কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। (সূরা গাফির - ৫৯)[২৭]

এ ছাড়া কোরান ক্বিয়ামতকে সত্য ও অলংঘনীয় প্রতিশ্রুতি বলে বর্ণনা করেছে

(بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا)

হ্যাঁ (প্রভুর) প্রতিশ্রুতি এ ব্যাপারে সত্য (নাহল - ৩৮)।[২৮]

মহান আল্লাহ একাধিকবার কিয়ামত সংঘটনের ব্যাপারে শপথ ঘোষনা করেছেন। যেমন :

(قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ)

বল, নিশ্চয়ই (পুনরুত্থিত) হবে, আমার প্রতিপালকের শপথ তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হইবে। অতঃপর তোমরা যা করতে সে সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে এবং তা আল্লাহর পক্ষে সহজ। (সূরা তাগাবুন- ৭)[২৯]

পবিত্র কোরানে পুনরুত্থানের ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করাকে নবীগণের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বলে গণনা করা হয়েছে। যেমন :

(يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ)

তিনি তার বান্দাদিগের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা ওহী প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ, যাতে সে সতর্ক করতে পারে ক্বিয়ামত দিবস সম্পর্কে। (গাফির- ১৫)[৩০]

এছাড়া পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারীদের জন্যে অনন্ত শাস্তি ও নরক যন্ত্রণার কথা উল্লেখপূর্বক বলা হয়েছে :

(وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا)

এবং যারা ক্বিয়ামতকে অস্বীকার করে তাদের জন্যে আমি প্রস্তত রাখিয়াছি জলন্ত অগ্নি। (ফুরকান- ১১)[৩১]

অতএব যে কেউ এ ঐশী গ্রন্থের সত্যতা সম্পর্কে জানতে পারবে, পুনরুত্থান সম্পর্কে দ্বিধা- দ্বন্দ্ব ও একে অস্বীকার করার মত কোন অজুহাতই তার থাকবে না। এছাড়া পূর্ববর্তী পাঠে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, কোরানের সত্যতা সকল সত্যানুসন্ধিৎসু ও ন্যায়পন্থী মানুষের জন্যে অনুধাবনযোগ্য। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে কারও নিকটই ক্বিয়ামতকে অগ্রাহ্য করার অজুহাত নেই - তবে তারা ব্যতীত, যাদের বুি ও জ্ঞানের স্বল্পতা আছে অথবা অন্য কোন কারণে কোরানের সত্যতাকে উপলব্ধি করতে অপারগ

বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলের প্রতি ইঙ্গিত :

কোরানের অনেক আয়াতই পুনরুত্থানের প্রয়োজনীয়তার স্বপক্ষে বু বৃত্তিক দলিলের প্রতি ইঙ্গিত করে থাকে। এ সকল আয়াতকে প্রজ্ঞা ও ন্যায়পরায়ণতা ভিত্তিক দলিলসমূহের প্রতীক বলা যেতে পারে। যেমন : তিরস্কারমূলক প্রশ্নাকারে বলে :

(أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ)

তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না ? (সূরা মু'মিনুন- ১১৫)।

উল্লিখিত আয়াতটি সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, যদি পুনরুত্থান ও আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারটি না থাকত, তবে এ বিশ্বে মানুষের সৃষ্টিই অনর্থক হয়ে যেত। কিন্তু প্রজ্ঞাময় প্রভু অনর্থক কর্ম সম্পাদন করেন না। অতএব নিজের দিকে প্রত্যাবর্তন করানোর জন্যে তিনি অপর এক জগতের ব্যবস্থা করবেন।

এ দলিলটি হল, একটি ব্যতিক্রমী যুক্তি ব্যবস্থা। এর প্রথম ভূমিকাটি (যা একটি শর্তযুক্ত যুক্তিবাক্য) এ যুক্তি উপস্থাপন করে যে, এ বিশ্বে মানুষের সৃষ্টি তখনই প্রজ্ঞাময় উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট হবে যখন মানুষ এ পার্থিব জীবনের পর, মহান প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে এবং পরকালে স্বীয় কর্মফল ভোগ করবে। আমরা এ অনিবার্য বিষয়টিকে প্রজ্ঞাগত দলিলের বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করেছিলাম। ফলে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

আর দ্বিতীয় ভূমিকাটি (মহান আল্লাহ অনর্থক কর্ম সম্পাদন করেন না) হল, প্রভুর প্রজ্ঞা এবং তার কর্ম অনর্থক না হওয়া, যা খোদাপরিচিতি অধ্যায়ে প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া তা প্রজ্ঞাগত দলিলের বর্ণনায়ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অতএব উল্লিখিত আয়াতটি সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত দলিলের উপর সমাপতনযোগ্য।

এখন মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এ পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছিল, এর আলোকে বলা যায়, যদি এ বিশ্বে মানুষের অনর্থক সৃষ্টি প্রজ্ঞাবিরোধী কর্ম হয়, তবে পৃথিবীর সৃষ্টিও হবে অনর্থক ও অহেতুক।

এ বিষয়টিকে আমরা সে আয়াত থেকে অনুধাবন করতে পারি, যাতে পরকালের অস্তিত্বকে এ বিশ্ব সৃষ্টির প্রজ্ঞাপূর্ণ দাবী বলে মনে করা হয়েছে । যেমন : জ্ঞানীগনের (اولو الالباب) বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ পূর্বক বলা হয় :

(وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)

এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে (এবং বলে) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এটা নিরর্থক সৃষ্টি করনি, (নিরর্থক কর্ম সম্পাদন থেকে) তুমি পবিত্র। তুমি আমাদেরকে অগ্নিশাস্তি হতে রক্ষা কর। (সুরা আল ইমরান - **১৯১**)

এ আয়াত থেকে আমরা আরও বুঝতে পারি যে, বিশ্বের সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পর্কে চিন্তাকরণ মানুষকে প্রভুর প্রজ্ঞা সম্পর্কে অবহিত করে। অর্থাৎ প্রজ্ঞাবান প্রভু তার এ মহান সৃষ্টির পশ্চাতে এক প্রজ্ঞাপূর্ণ উদ্দেশ্যকে বিবেচনা করেছেন এবং একে অহেতুক ও বৃথা সৃষ্টি করেননি। যদি অন্য এমন কোন জগতের অস্তিত্ব না থাকে, যা বিশ্বসৃষ্টির চুড়ান্ত উদ্দেশ্য বলে পরিগণিত হবে, তবে স্রষ্টার সৃষ্টি বৃথা ও নিরর্থক হয়ে পড়বে।

পুনরুত্থানের আবশ্যকতার স্বপক্ষে বু বৃত্তিক দলিলের ইঙ্গিতবহ, অপর এক শ্রেণীর আয়াতকে, ন্যায়পরায়ণতাভিত্তিক দলিল বলে গণনা করা যেতে পারে।[৩২] অর্থাৎ প্রভুর ন্যায়পরায়ণতার দাবী হল, সৎকর্মকারী ও দুষ্কৃতকারীদেরকে তাদের কর্মের পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করা এবং তাদের পরকালীন জীবনকে পৃথক করা। আর যেহেতু এবিশ্বে এ ধরনের কোন পার্থক্য বিরাজ করে না, সেহেতু ন্যায়পরায়ণ প্রভুর জন্যে অপর এক জগৎ সৃষ্টিকরণ আবশ্যক, যাতে স্বীয় ন্যায়পরায়ণতাকে বাস্তবায়িত করতে পারেন। যেমন :

(أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ)

দুষ্কৃতকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়া উহাদিগকে তাহাদিগের সমান গণ্য করিব, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে ? উহাদিগের সি ান্ত কত মন্দ (এবং যেমনিকরে পার্থিব আনন্দ- বেদনা, দুঃখ- কষ্ট ও নিয়ামতের অংশীদার, মৃত্যুর পরও তেমনি তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিবে না ?) (জাসিয়াহ - ২১)

(وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ)

আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্মানুযায়ী ফল পেতে পারে, আর তাদের প্রতি জুলম করা হবে না। (জাছিয়া - ২২)

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ (অর্থাৎ আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবেএ বাক্যটিকে প্রজ্ঞাভিত্তিক দলিলের ইঙ্গিতবহ বলে গণনা করা (যেতে পারে; যেমনিকরে ন্যায়পরায়ণতাভিত্তিক দলিলকে মুলতঃ প্রজ্ঞাভিত্তিক দলিলের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কারণ যেমনটি আমরা প্রভুর ন্যায়পরায়ণতা শীর্ষক আলোচনায় ব্যাখ্যা করেছিলাম যে, ন্যায়পরায়ণতা একটি দৃষ্টান্ত। (حكمت) হল প্রজ্ঞারই (عل)

৮ম পাঠ

পরকালীন জগতের বিশেষত্বসমূহ

ভূমিকা :

যে সকল বিষয় সম্পর্কে মানুষের কোন অভিজ্ঞতা নেই অথবা যেগুলোকে অন্তর্দৃষ্টিগত ও প্রত্যক্ষ সচেতন জ্ঞানের মাধ্যমে উপলব্ধি করেনি কিংবা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেও অনুভব করতে পারেনি, তবে সে সকল বিষয় সম্পর্কে মানুষ পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারেনা। ফলে এ বিষয়টির আলোকে আমাদের মনে রাখতে হবে, পরকালীন জীবনের স্বরূপ ও ঘটনাপ্রবাহসমূহকে সঠিকরূপে অনুধাবন করতে পারব - এটা আশা করা অনুচিত। বরং বু ি বৃত্তির মাধ্যমে অথবা ওহীর মাধ্যমে পরকালের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যতটুকু জানতে পারি, তাতেই তুষ্ট থাকব এবং ততোধিক ভাবনা থেকে বিরত থাকব।

পরিতাপের বিষয় হল, একদিকে একদল লোক পরজগৎকে ইহজগতের মত বলে প্রচার করার চেষ্টা করছেন এবং এমনকি তাদের কল্পনা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তারা বলেন : পরকালীন বেহেশত আকাশেরই এক বা একাধিক স্তরে ইহজগতেই বিদ্যমান। আর একদা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও আবিষ্কারের মাধ্যমে মানুষ সেথায় অবস্থান গ্রহণ করবে এবং অনাক্লিষ্ট ও পরিতৃপ্ত জীবনের অধিকারী হবে।

অপরদিকে অপর একদল, পরকালের বাস্তবতাকেই অস্বীকার করেছেন এবং চিরন্তন বেহেশতকে চারিত্রিক মূল্যবোধ বলেই মনে করেছেন, যা সমাজের বিভিন্ন মুক্তমনা ও সেবক মানুষের কামনা হয়ে থাকে। এছাড়া এ ধরনের লোকেরা ইহ ও পরকালের পার্থক্যকে লাভ ও মূল্যমানের পার্থক্যের মত মনে করেছেন।

প্রাগুক্ত প্রথম দলের কাছে প্রশ্ন করার অবকাশ থাকে : যদি চিরন্তন বেহেশত অপর এক গ্রহে থেকে থাকে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সেখানে যাবে এ কথা সঠিক হয়ে থাকে, তবে পুনরুত্থান

দিবসে যে সকল মানুষকে জীবিত করা হবে, যা পবিত্র কোরানে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে, তার অর্থ কী?

অনুরূপ দিতীয় দলের কাছেও প্রশ্ন থাকতে পারে : যদি বেহেশত কেবলমাত্র চারিত্রিক মূল্যবোধ ব্যতীত কিছুই না হয়ে থাকে এবং স্বভাবতঃই দোযখও যদি কেবলমাত্র মূল্যবোধ বিরোধী বৈ কিছুই না হয়ে থাকে, তবে পুনরুত্থান ও পুনর্জীবন লাভের বিষয়াটি প্রমাণ করার জন্যে কোরানের এত পীড়াপীড়ি কেন? এটাই কি ভাল ছিল না যে, আল্লাহর বাণীবাহকগণ এ অর্থটিকেই সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করতেন, যাতে অতসব বিরোধিতা, উন্মাদাখ্যা ও প্রলাপবকা ইত্যাদি অপবাদে ভূষিত না হন ?

যা হোক এ সকল অনর্থক বাক্যাল্যাপের যবনিকা টেনে শারীরিক ও আত্মিক পুনরুত্থানের বিষয়ে দার্শনিক ও কালামবিদদের মধ্যে যে বিরোধ ও মতপার্থক্য বিদ্যামান সে গুলোতে মনোনিবেশ করব। এছাড়া ঐ সকল বিষয় সম্পর্কেও আলোচনা করব যে, এ ব জগৎ কি সম্পূর্ণরূপে বিনাশিত হবে, না কি হবে না ? এবং পরকালীন দেহ কি পুরোপুরি এ পার্থিব দেহই, না এর মত হবে ? ইত্যাদি।

সত্য উদঘাটন অথবা বাস্তবতার নিকটবর্তী হওয়ার জন্যে এ ধরনের বু বৃত্তিক ও দার্শনিক প্রচেষ্টা যতই প্রশংসাযোগ্য কিংবা এর ছায়ায় চিন্তাগত দূর্বল ও শক্তিশালী দিকগুলো যতই সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হোক না কেন, এটা আশা করা কখনোই উচিৎ নয় যে, এ সকল আলোচনার মাধ্যমে পরকালীন জীবন যেমন আছে ঠিক তেমনটিই অনুধাবণ করতে পারব। প্রকৃতপক্ষে অদ্যাবধি এ পৃথিবীর বাস্তবতাসমূহও কি সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করা গিয়েছে? পদার্থবিদ, রসায়নবিদ ও জীববিজ্ঞানী এবং অন্যান্য মনীষীগণ কি ব , শক্তি ও অন্যান্য শক্তি বৈচিত্রের স্বরূপ উদঘাটনে সক্ষম হয়েছেন ? তারা কি বিশ্বের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চূড়ান্ত ধারণা দিতে সক্ষম ? তারা কি জানেন, যদি এ বিশ্বব্রম্মাণ্ড থেকে মহাকর্ষশক্তির অপসারণ করা হয় অথবা ইলেকট্রনের গতিকে স্তব্ধ করা হয়, তবে কি ঘটনা ঘটতে পারে ? কিংবা এ ধরনের ঘটনা ঘটবে কি না ?

দার্শনিকগণও কি এ বিশ্বের সকল বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়সমূহকে নিশ্চিতরূপে সমাধান করতে ? ব সমূহ (اجسام), প্রকারান্ত গঠনসমূহ (صور نوعیه) এবং আত্মা ও দেহের সম্পর্ক ইত্যাদির মত বিষয়সমূহের বাস্তবতাকে উদঘাটনের জন্যে অধিকতর গবেষণার প্রয়োজন নয় কি? (নিশ্চয়ই) তবে কিরূপে আমরা নিজেদের এ সকল সীমাব ও সল্প জ্ঞান ও চিন্তার মাধ্যমে এমন এক জগতের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করব, যার সম্পর্কে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই ?

তবে মানুষের জ্ঞানের সল্পতার অর্থ এ নয় যে, মানুষ কোন কিছুকেই কোন ভাবেই উপলব্ধি করতে সক্ষম নয় কিংবা বাস্তব অস্তিত্বকে অপেক্ষাকৃত ভাল ভাবে অনুধাবন করার জন্যে চেষ্টা করা অনুচিত। নিঃসন্দেহে আমরা প্রভু প্রদত্ত বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে অধিকাংশ বাস্তবতাকেই উপলব্ধি করতে সক্ষম। অনুরূপ সক্ষম ইন্দ্রিয় ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রকৃতির অনেক রহস্যের অবগুন্ঠন উন্মোচন করতে। তবে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারের সমৃদ্ধি ঘটাতে, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রচেষ্টার পথে চলার পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তির শক্তি সীমা ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের পারঙ্গমতা সম্পর্কে আমাদের জানা থাকতে হবে। আর তাই অনর্থক উচ্চাভিলাষ থেকে নিজেদেরকে সংযত করব এবং স্বীকার করে নিব যে,

(وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا)

তোমাদিগের নিকট জ্ঞানের ক্ষুদ্রাংশ ব্যতীত কিছুই আসে নাই।(ইসরা - ৮৫)

হ্যাঁ জ্ঞানীরূপ বাস্তবদর্শিতা, প্রজ্ঞাধিকারীরূপ বিনতী ও দায়িত্বশীলরূপ ধর্মীয় সংযমের দাবী হল এই যে, ক্বিয়ামত ও অদৃশ্যজগৎ সম্পর্কে চূড়ান্ত মতবাদ ব্যক্তকরণ কিংবা অযৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদান থেকে সংযত থাকব। তবে যতটুকু বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি এবং কোরানের সুস্পষ্ট দলিল অনুমতি দেয়, ঠিক ততটুকু ব্যক্ত করেই ক্ষান্ত হব ।

যা হোক প্রত্যেক বিশ্বাসী ব্যক্তির জন্যে যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়, তার সত্যতাকে স্বীকার করাই যথেষ্ট, যদিও ঐগুলোর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য নির্ধারিতরূপে জানতে অথবা

ঐগুলোর ব্যাখ্যা দিতে অপারগ। বিশেষকরে ঐ সকল বিষয় যেগুলো আমাদের অভিজ্ঞতা ও বুি বৃত্তির নাগালের বাইরে এবং আমাদের জ্ঞান ঐগুলোতে পৌঁছতে অপারগ।

এখন আমরা চেষ্টা করে দেখব, বুি বৃত্তিক উপায়ে পরজগতের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব এবং ইহজগতের সাথে এর পার্থক্য সম্পর্কে কতটুকু ধারণা লাভ করতে পারি।

বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরজগতের বিশেষত্বসমূহ :

পুনরুত্থানের আবশ্যকতার স্বপক্ষে উপস্থাপিত দলিলের উপর চিন্তা করলেই পরজগতের বিশেষত্বসমূহ খুজে পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো উল্লেখযোগ্য ।

১। পরজগতের প্রথম বিশেষত্ব যা প্রথম দলিল থেকে অর্জিত হয় তা হল : পরজগৎ চিরন্তন ও অনন্ত হতে হবে। কারণ ঐ দলিলে চিরন্তন জীবনের সম্ভাবনা ও এ ধরনের জীবনের উপর মানুষের ফিত্রাতগত চাহিদার গুরুত্ব এবং এর সংঘটন প্রভুর প্রজ্ঞার দাবী বলে পরিগণিত হয়েছে।

২। অপর যে বিশেষত্ব, যা উভয় দলিল থেকে অর্জিত হয় এবং যা প্রথম দলিলের অন্তরালে ইঙ্গিত করা হয়েছে তা হল : পরজগতের নিয়ম- শৃংখলা এমন হতে হবে যেন, ঐ সকল ব্যক্তিই নির্মল অনুগ্রহ এবং কষ্টক্লেশমুক্ত বৈভবের অধিকারী হতে পারেন যারা চরম মানবীয় উৎকর্ষে পৌঁছতে পেরেছেন এবং কোন প্রকার পাপাচার ও বিচ্যুতিতে লিপ্ত হননি, যা ইহজগতের ব্যতিক্রম। ইহজগতে এ ধরনের কোন নিরংকুশ সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। বরং পার্থিব সৌভাগ্য হল, আপেক্ষিক ও কষ্টক্লেশ মিশ্রিত।

৩। তৃতীয় বিশেষত্ব হল : কর্মফল লাভের জন্যে পরজগতের কমপক্ষে অনুগ্রহ ও শাস্তি, এ দু'টি বিভাগ থাকতে হবে, যাতে সুকীর্তিকারী ও দুস্কৃতিকারীরা পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মফল লাভে সক্ষম হয়। আর এ দু'টি বিভাগ ঠিক তা- ই যা শরীয়তের ভাষায় বেহেশত ও দোযখ বলে পরিচিত।

৪। চতুর্থ বিশেষত্ব, যা বিশেষকরে ন্যায়পরায়ণতাভিত্তিক দলিল থেকে অর্জিত হয় তা হল : পরজগৎকে এতটা বিস্তৃত হতে হবে যে, সকল মানুষের সুকর্ম ও দুষ্কর্ম অনুসারে তাদেরকে পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করা যায়। যেমন : যদি কেউ লক্ষ লক্ষ মানুষকে অন্যায় ভাবে হত্যা করে থাকে, তবে তাকে শাস্তি দেয়া যেমন সম্ভব হয় তেমনি যদি কেউ লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন নির্বাহের ব্যবস্থা করে থাকে তবে তাকেও পুরস্কৃত করা সম্ভব হয়।

৫। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অপর বিশেষত্বটি, যা এ ন্যায়পরায়ণতাভিত্তিক দলিল থেকেই হস্তগত হয় এবং উক্ত দলিল উপস্থাপনের সময় ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পরকাল হল 'কর্মফল লাভের স্থান' কর্ম সম্পাদনের স্থান নয়।

এর ব্যাখ্যা হল : পার্থিব জীবন এরূপ যে, মানুষ পরস্পরবিরোধী ইচ্ছা ও আকাংখা পোষণ করে থাকে এবং সর্বদা দ্বিধা- বিভক্ত পথপ্রান্তে অবস্থান নিয়ে থাকে । ফলে এ দু'য়ের মধ্যে যে কোনটিকে নির্বাচন করতে বাধ্য হয়। আর এ বিষয়টিই সে কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করে, যা জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত অবিরত চলতে থাকে। প্রভুর প্রজ্ঞা ও ন্যায়পরায়ণতার দাবী হল, যারা নিজ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেননি, তারা যথোপযুক্ত পুরস্কার লাভ করবে এবংএর অন্যায়কারীরা নিজ কর্মের শাস্তি ভোগ করবে।

এখন যদি আমরা কল্পনা করি যে, কর্মক্ষেত্র ও এর নির্বাচন পরজগতেও বিদ্যমান তবে প্রভুর অনুগ্রহ ও কল্যাণের দাবী হল : কর্ম সম্পাদন ও নির্বাচনের অন্তরায় না হওয়া। আর এভাবে পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানের জন্যে অপর এক জগৎ আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। তখন যে জগৎকে আমরা পরজগৎ হিসেবে কল্পনা করেছি, প্রকৃতপক্ষে তা অপর এক ইহজগৎ রূপে পরিগণিত হয়। আর প্রকৃত পরকালীন জগৎ হল সর্বশেষ ও চূড়ান্ত জগৎ, যেখানে আর কোন দায়িত্ব, পরীক্ষা ও এর ক্ষেত্র (অর্থাৎ একাধিক চাহিদার মধ্যে কোন বিরোধ) থাকবে না।

আর এখানেই ইহ ও পর জগতের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য প্রকাশ লাভ করে। অর্থাৎ ইহজগৎ হল এমন এক জগৎ, যেখানে নির্বাচন ও পরীক্ষার ক্ষেত্র বিদ্যমান। অপরদিকে পরজগৎ হল সেই জগৎ, যেখানে ইহজগতে যে সকল সুকর্ম ও দুষ্কর্ম সম্পাদন করেছে, সেগুলোর চিরন্তন

পুরস্কার, শাস্তি ও ফল গ্রহণের ক্ষেত্র বিদ্যমান। আজ প্রকৃতপক্ষে কর্ম সম্পাদনের সময়, হিসেবের সময় নয়, আর কাল হল হিসেবের সময়, কর্ম সম্পাদনের সময় নয়। (নাহজুল বালাগ্বা, খোতবাহ - ৪২)

৯ম পাঠ

মৃত্যু থেকে ক্বিয়ামত

ভূমিকা :

আমরা জানি যে, আমরা আমাদের এ ক্ষুদ্র জ্ঞানে পরকালের ঘটনা প্রবাহ এবং পরম অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা লাভ করতে অক্ষম। তাই কেবলমাত্র বুি বৃত্তিক দলিলের ভিত্তিতে যে একশ্রেণীর সামগ্রিক ধারণা লাভ করতে পারি এবং ওহীর মাধ্যমে পরকালের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বসমূহের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতেই তুষ্ট থাকব। তবে পরজগতের বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে কখনো কখনো যে সকল পরিভাষা ব্যবহার করা হয় সম্ভবতঃ তা সাদৃশ্যার্থেই ব্যবহার করা হয়। ফলে ঐ সকল পরিভাষা শ্রবণের মাধ্যমে যে ধারণা লাভ হয়ে থাকে সম্ভবতঃ তা বাস্তব দৃষ্টান্তের সাথে সম্পূর্ণরূপে না- ও মিলতে পারে। আর এটা বর্ণনার অপারগতা নয় বরং আমাদের বোধের অক্ষমতার কারণেই হয়ে থাকে। নতুবা আমাদের মস্তিষ্কের কাঠামোকে বিবেচনা করতঃ যে সকল শব্দসমষ্টি ঐ সকল বাস্তবতার প্রদর্শক হতে পারে নিঃসন্দেহে তা ঐ সকল শব্দসমষ্টিই, যা পবিত্র কোরান নির্বাচন করেছে ।

যেহেতু কোরানের বর্ণনা পরকালের সূচনালগ্নকেও সমন্বিত করে সেহেতু ‘মানুষের মৃত্যু’ থেকেই আমাদের আলোচনা রু করব।

সকল মানুষই মৃত্যুবরণ করবে :

পবিত্র কোরান গুরুতের সাথে উপস্থপন করে যে, সকল মানুষেরই(বরং সমস্ত জীবনেরই) মৃত্যুর সাদ গ্রহণ করতে হবে এবং এ পৃথিবীতে কোন কিছুই চিরস্থায়ীভাবে থাকবে না ।

(كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ)

যা কিছুই এখানে (পৃথিবীতে) বিদ্যমান, ধবংসপ্রাপ্ত হবে। (আর রাহমান- ২৬)

(كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ)

প্রত্যেকেই মৃত্যুরস্বাদ আস্বাদন করবে। (আল্ ইমরান- ১৮৫)

মহানবীকে (সা.) উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে :

(إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ)

প্রকৃতপক্ষে তুমিও মৃত্যু বরণ করবে এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে। (যুমার- ৩০)

(وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ)

আমি তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি, সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীবি হয়ে থাকবে ? (আম্বিয়া - ৩৪)

অতএব মৃত্যু প্রত্যেক জীবনের জন্য এক সামগ্রিক ও অব্যতিক্রমধর্মী নিয়ম।

সমস্ত আত্মার হরণকারী :

পবিত্র কোরানে একদিকে আত্মার হরণকারী হিসেবে মহান আল্লাহর কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে :

(اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا)

আল্লাহই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের, তাদের মৃত্যুর সময়। (যুমার - ৪২)

অপরদিকে মৃত্যুর ফেরেশতাকে রূহ কবজ করার জন্যে আদিষ্ট বলে পরিচয় দেয়া হয়েছে :

(قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ)

বল, তোমাদের জন্যে নিযুক্ত মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। (১১ - সেজদা)

অপর এক স্থানে প্রাণ হরণকারী হিসেবে ফেরেশতাগণ এবং প্রভু কর্তৃক প্রেরিতগণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে :

(حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا)

অবশেষে যখন তোমাদের কারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিতরা তার মৃত্যু ঘটায়। (৬১ -আনয়াম)

স্পষ্টতঃই যখন কোন কর্তা, অপর কোন কর্তার মাধ্যমে কোন কার্য সম্পাদন করে, তবে ঐ কার্যের কর্তারূপে উভয়কেই উল্লেখ করা সঠিক। অনুরূপ যদি দিতীয় কর্তাও অপর কোন কর্তার মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করে, তবে তৃতীয় কর্তাকে কার্য সম্পাদনকারী হিসেবে গণনা করা সঠিক হবে। যেহেতু মহান আল্লাহ আত্মাসমূহের হরণকর্ম মৃত্যুর ফেরেশতার (ملک الموت)মাধ্যমে সম্পন্ন করেন এবং তিনিও যেহেতু তার অনুগ্রত ফেরেশতাদের মাধ্যমে উক্ত কর্ম সম্পাদন করেন, সেহেতু উক্ত তিনজনকেই কার্যের সম্পাদনকারী হিসেবে মনে করা সঠিক।

সহজ ও কঠোরভাবে আত্মার হরণ :

পবিত্র কোরানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর নিযুক্তগণ সকল মানুষের প্রাণ একইভাবে গ্রহণ করেন না। বরং কারও কারও ক্ষেত্রে খুব সহজ ও সম্মানের সাথে এবং কারও কারও ক্ষেত্রে কঠোর ও অপমানের সাথে প্রাণ হরণ করে থাকেন। উদাহরণতঃ মু'মিনগণের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে:

(الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ)

ফেরেশতাগণ যাদের মৃত্যু ঘটায় আনন্দাবস্থায় (তাদেরকে) ফেরেশতাগণ বলবে, 'তোমাদের প্রতি শান্তি (ও সম্মান)! (নাহল - ৩২)[৩৩]

আবার কাফেরদের সম্পর্কে বলে :

(وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ)

তুমি যদি দেখতে পেতে ফেরেশতাগণ কাফেরদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে তাদের প্রাণ হরণ করছে (৫০ - আনফাল)[৩৪]

মৃত্যুকালে তওবাহ্ ও বিশ্বাস স্থাপণের কোন মূল্য নেই :

যখন কাফের ও পাপিষ্ঠদের মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং পৃথিবীতে আর বেঁচে থাকার কোন আশা থাকে না তখন পূর্বে সম্পাদিত স্বীয় কর্ম সম্পর্কে অনুতপ্ত হয় এবং বিশ্বাস স্থাপন করে ও নিজের পাপের জন্যে তওবাহ করে। কিন্তু মহান আল্লাহর নিকট এ ধরনের বিশ্বাস ও তওবার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। পবিত্র কোরান এ সম্পর্কে বলে :

(يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا)

যে দিন তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে সে দিন তার ঈমান কাজে আসবে না, যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনেনি কিংবা যে ব্যক্তি ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করেনি। (আনআম - ১৫৮)

(وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ...)

তওবাহ তাদের জন্যে নয় যারা আজীবন মন্দ কাজ করে এবং তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, 'আমি এখন তওবাহ্ করছি, ... । (নিসা - ১৮)

ফেরাউনের বক্তব্যে উল্লেখিত হয়েছে যে, যখন নিমজ্জিত হচ্ছিল (নীল নদের পানিতে), তখন বলছিল :

(آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ)

আমি বিশ্বাস করলাম যে, বনী ইসরাঈল যাতে বিশ্বাস করে - তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (ইউনূস- ৯০)

এবং তার উত্তরে বলা হয় :

(آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ)

এখনইতিপূর্বে তো তুমি অমান্য করেছি এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টি !কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। সূ)রা ইউনুস(৯১ -

পৃথিবীতে ফিরে আসার ইচ্ছা :

অনুরূপ পবিত্র কোরান কাফের ও দুস্কৃতিকারীদের সম্পর্কে বর্ণনা করে যে, যখন তাদের মৃত্যু উপস্থিত হয় অথবা বিধ্বংসী আযাব তাদের উপর অবর্তীণ হয়, এই ইচ্ছা পোষণ করে :'হায় ! যদি পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারতাম এবং বিশ্বাসী ও সৎকর্মকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতাম!' অথবা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে যে, আমাদেরকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দিন, যাতে আমাদের পূর্ববর্তী কর্মসমূহের ক্ষতিপূরণ করতে পারি। কিন্তু এ ধরনের আকাংখা ও প্রার্থনার কোন কার্যকারিতা নেই ।[৩৫] কোন কোন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি তাদেরকে ফিরিয়েও দেয়া হত তবে তারা(পৃথিবীতে) পূর্বের প্রক্রিয়াই চালিয়ে যেত।[৩৬] অনুরূপ ক্বিয়ামতের দিনেও এ ধরনের ইচ্ছা ও প্রার্থনা করবে, যার জবাব প্রাথমিকভাবেই নেতিবাচক হবে।

(حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا)

যখন তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালকআমাকে পুনরায় ! প্রেরণ কর, যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি পূর্বে করিনি। না, তা হওয়ার নয়। এটা তো তার একটি উক্তি মাত্র। (এবং এটা এমন এক আকাংখা, যা কখনোই কার্যকরী হবে না)। (মু'মিনুন ৯৯- ১০০)

(أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ)

অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেন কাকেও বলতে না হয়, 'আহা, যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটত, তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হতাম। (৫৮ -যুমার)

(وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)

যখন তাদেরকে অগ্নির পার্শ্বে দাঁড় করান হবে এবং তারা বলবে হায়যদি আমাদের প্রত্যাবর্তন ! ঘটত তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে অস্বীকার করতাম না এবং আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। আনআম)- ২৭

(إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ)

যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে অধোবদন হয়ে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম; এখন তুমি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ কর, আমরা সৎকর্ম করব, আমরা তো দৃঢ়বিশ্বাসী। (সেজদা- ১২)

উল্লেখিত আয়াতসমূহ থেকে সুস্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, পরকাল নির্বাচন ও কার্য সম্পন্ন করার স্থান নয়। এমনকি যে দৃঢ়বিশ্বাস মৃত্যুর সময় অথবা পরজগতে অর্জিত হয়, মানুষের উৎকর্ষের পথে তারও কোন গুরুত্ব নেই এবং তা তাকে পুরস্কারের যোগ্যও করে তুলে না।

এভাবেই কাফের ও পাপিষ্ঠরা পৃথিবীতে ফিরে আসার ইচ্ছা পোষণ করে, যাতে স্বেচ্ছায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে ও যথোপযুক্ত কার্য সম্পন্ন করতে পারে।

বারযাখ

পবিত্র কোরানের আয়াত থেকে আমরা দেখতে পাই যে, মানুষ মৃত্যুর পর কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট সময় কবর ও বারযাখে অতিবাহিত করবে এবং কিছুটা হলেও ভোগ ও বিলাস অথবা কষ্ট ও ক্লেশের অধিকারী হবে। অনেক রেওয়াতে এসেছে যে, বিশ্বাসী পাপীরা এ সময় তাদের পাপানুপাতে কিছু কষ্ট ও ক্লেশ ভোগের মাধ্যমে পবিত্র হয়, যাতে পরজগতে দায়ভার মুক্ত হতে পারে।

যেহেতু বারযাখ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ ব্যাখ্যা -বিশ্লেষণের দাবী রাখে, সেহেতু ঐগুলো সম্পর্কে আলোচনা না করে কেবলমাত্র একটি আয়াতের উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হচ্ছি। পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে :

(وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ)

তাদের সম্মুখে (তাদের মৃত্যুর পর) বারযাখ থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। (মু'মিনুন- ১০০)

১০ম পাঠ

পবিত্র কোরানে পুনরুত্থানের চিত্র

ভূমিকা :

পবিত্র কোরান থেকে জানা যায় যে, পরজগতের অস্তিত্বলাভ   ধুমাত্র মানুষের নবজীবন লাভের সাথেই সম্পর্কিত নয়। বরং মূলতঃ এ পার্থিব জগতের সকল নিয়মের পরিবর্তন ঘটে এবং অপর এমন এক জগৎ এক নতুন নিয়মশৃঙ্খলা নিয়ে প্রকা -শ লাভ করে, যে জগৎ আমাদের ধারণাতীত এবং স্বভাবতঃই এ জগতের বিশেষত্ব সম্পর্কে আমাদের কোন সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকতে পারে না। তখন সৃষ্টির   রু থেকে শেষ পর্যন্ত যত মানুষ ছিল সকলেই একইসাথে জীবন লাভ করে এবং স্বীয় কৃতকর্মের ফল লাভ করে। আর বৈভব বা শাস্তির অধিকারী হয়।

যেহেতু এ আলোচনা সংশ্লিষ্ট আয়াতের সংখ্যা ব্যাপক এবং এগুলোর আলোচনার জন্যে বিস্তৃত সময়ের প্রয়োজন, তাই কেবলমাত্র ঐ আয়াতগুলোর অন্তর্গত বিষয়সমূহকে সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করেই তুষ্ট থাকব।

পৃথিবী, **সমূদ্র ও পর্বতসমূহের অবস্থা** :

পৃথিবীতে এক মহা ভূকম্পনের সৃষ্টি হবে[৩৭] এবং যা কিছু ভূঅভ্যন্তরে আছে বের করে দিবে[৩৮] , এর বিভিন্ন অংশ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে -[৩৯] সমূদ্রসমূহ বিভক্ত হয়ে পড়বে[৪০] , পর্বতসমূহ গতিশীল[৪১] ও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে[৪২] এবং বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে[৪৩], অতঃপর ধুনকৃত তুলার রূপ ধারণ করবে[৪৪] অতঃপর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে[৪৫] এবং গগনচুম্বী পর্বতসমূহ মরিচীকায় রূপ নিবে।[৪৬]

আকাশ ও নক্ষত্রসমূহের অবস্থা :

চন্দ্র[৪৭] সূর্য[৪৮] বৃহদাকার নক্ষত্রসমূহ, যাদের কোন কোনটি আমাদের সূর্যের লক্ষ লক্ষগুণ বৃহৎ ও উজ্জ্বল তাদের সকলেই নির্বাপিত ও তিমিরে পরিণত হবে।[৪৯] ঐগুলোর গতির শৃংখলা বিনষ্ট হবে।[৫০] যেমন চন্দ্র ও সূর্য একাকার হয়ে যাবে :[৫১] এবং যে আকাশ এ পৃথিবীর উপর সুরক্ষিত ও দৃঢ় ছাদ সদৃশ তা দুর্বল, প্রকম্পিত[৫২] ও বিদীর্ণ হবে এবং পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে[৫৩], কুণ্ডলাকৃতি হয়ে পরস্পর ছড়িয়ে পড়বে[৫৪] আকাশের জড় উপাদানগুলো গলিত ধাতুর রূপ ধারণ করবে[৫৫] এবং বিশ্বের সর্বত্র ধুম্রাচ্ছন্ন ও মেঘাচ্ছন্ন হবে ।[৫৬]

মৃত্যু শানাই :

আর এ ধরনের পরিস্থিতিতেই মৃত্যু শানাই বেজে উঠবে। সকল জীবিত অস্তিত্বেরই মৃত্যু ঘটবে[৫৭] এবং প্রকৃতি ভুবনে আর কোন জীবনের অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যাবে না। আর ভয় ভীতি -ও অনিশ্চয়তার ছায়া সকল মানুষের উপর নেমে আসবে[৫৮] কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা বাস্তবতা ও অস্তিত্বের রহস্য সম্পর্কে অবগত এবং যাদের আত্মাগুলো প্রভুর জ্ঞান ও প্রেমের গভীরে নিমজ্জিত।

জাগরণতুর্য এবং পুনরুত্থানের সূচনা :

অতঃপর অমর এ চিরন্তনতার অধিকারী অপর এক জগৎ অস্তিত্ব লাভ করবে[৫৯], ধরিত্রীর রূপ ঐশী জ্যোতির আলোকে আলোকিত হবে[৬০], জাগরণতুর্য উচ্চনিনাদে বেজে উঠবে[৬১], সকল মানুষ (এমনকি সকল প - পাখীও)[৬২] এক মুহূর্তের মধ্যে পুনর্জীবন লাভ করবে[৬৩], হতভম্ভ ও হতচকিত[৬৪] পঙ্গপাল ও প্রজাপতির মত[৬৫] দ্রুত গতিতে[৬৬] প্রভুর দিকে ধাবিত হবে[৬৭] এবং সকলেই এক মহা ময়দানে উপস্থিত হবে ।[৬৮] এমতাবস্থায় অধিকাংশেরই দাবী থাকবে যে, বারযাখে তাদের অবস্থান হয়েছিল একঘণ্টা, একদিন অথবা কয়েকদিন।[৬৯]

প্রভুর বিচারব্যবস্থার বহিঃপ্রকাশ এবং পারস্পরিক সম্পর্কোচ্ছেদ :

ঐ জগতে সকল বাস্তবতা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হবে[৭০] এবং প্রভুর শাসন ব্যবস্থা ও রাজত্ব চূড়ান্ত রূপ ধারণ করবে[৭১] আর সৃষ্টির উপর এমন আতংকের ছায়া নেমে আসবে যে, কারোই উচ্চবাচ্য করার কোন সামর্থ্য থাকবে না ।[৭২] প্রত্যেকেই নিজ নিজ অদৃষ্টের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে এবং এমনকি সন্তানরা পিতামাতা থেকে -, নিকটজন ও আত্মীয় -স্বজন পরস্পর থেকে পলায়ন করবে ।[৭৩] মূলত: আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হবে[৭৪] এবং পার্থিবলাভ ও শয়তানী মানদণ্ডের ভিত্তিতে যে সকল বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল, সে সকল সম্পর্ক শত্রুতায় পরিণত হবে ।[৭৫] ইতিপূর্বে কৃত অপরাধের জন্যে অনুতাপ ও অনুশোচনায় হৃদয় আবিষ্ট হবে ।[৭৬]

প্রভুর ন্যায়দণ্ড :

অতঃপর প্রভুর ন্যায়দণ্ডভিত্তিক বিচারালয় রূপ লাভ করবে এবং সকল বান্দাদের কৃতকর্ম উপস্থিত হবে[৭৭], আমলনামাসমূহ বিতরণ করা হবে[৭৮], কোন কর্তার কৃতকর্ম এতটা সুস্পষ্ট যে, কাউকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হবে না যে, কী করেছে ?[৭৯]

এ বিচারালয়ে ফেরেশতাগণ, নবীগণ ও আল্লাহর নির্বাচিতগণ সাক্ষীরূপে উপস্থিত হবেন ।[৮০] এমনকি মানুষের হস্ত, পদ এবং ত্বকও সাক্ষ্য প্রদান করবে ।[৮১] সকল মানুষের হিসাব পুঙ্খানুপঙ্খ রূপে ও প্রভুর ন্যায়দণ্ডের ভিত্তিতে পরিমাপ করা হবে[৮২] এবং ন্যায় ও আদলের ভিত্তিতে তাদের বিচার করা হবে ।[৮৩] প্রত্যেকেই তার চেষ্টা ও শ্রমের ফল লাভ করবে ।[৮৪] সৎজনকে তার কর্মের দশগুণ বেশী পুরস্কার প্রদান করা হবে[৮৫] এবং কেউই কারও বোঝা বহন করবে না।[৮৬] কিন্তু যারা অন্যান্যদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে, তারা নিজেদের পাপ ছাড়াও পথভ্রষ্টদের পাপও স্বীয় স্কন্ধে ধারণ করবে ।[৮৭] (তাদের পাপ লাঘব তো হবেই না) উপরন্তু তাদের নিকট থেকে (তাদের পাপকর্মের পরিবর্তে) কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না[৮৮] এবং (তাদের জন্যে) কারও সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না ।[৮৯] কেবলমাত্র তাদের সুপারিশই গ্রহণ করা হবে, যারা মহান আল্লাহর অনুমতি প্রাপ্ত হবেন এবং তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির মানদণ্ডের ভিত্তিতে শাফায়াত করবেন ।[৯০]

অনন্ত জীবনের পথে :

অতঃপর আল্লাহর আদেশ ঘোষণা করা হলে[৯১] সৎকর্ম সম্পাদনকারী ও অন্যায়কারীরা পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যাবে।[৯২] বিশ্বাসীগণ আনন্দিত ও হাস্যোজ্জ্বল বদনে বেহেশতে[৯৩] এবং অবিশ্বাসীরা অপমানিত, লাঞ্ছিত ও মলিনবদনে দোযখের পথে যাত্রা করবে।[৯৪] সকলেই দোযখের পথ অতিক্রম করবে।[৯৫] তবে বিশ্বাসীগণের বদন থেকে জ্যোতি নির্গত হবে এবং স্বীয় পথকে উজ্জ্বল করবে[৯৬] আর কাফের ও মুনাফিকরা অন্ধকারে পতিত হবে।

যে মুনাফিকরা পৃথিবীতে মু'মিনদের সাথে মিশে ছিল, তারা মু'মিনগণের নিকট তাদের দিকে ফিরে তাকাতে ফরিয়াদ করবে, যাতে তাদের জ্যোতি ব্যবহার করে মুক্তির পথ খুজে বের করতে পারে। মু'মিনদের পক্ষ থেকে জবাব দেয়া হবে "জ্যোতি লাভ করতে পশ্চাতে (পৃথিবীতে) ফিরে যাও! মুনাফিকরা বলবে : আমরা কি পৃথিবীতে তোমাদের সাথে ছিলাম না ? জবাবে বলা হবে : কেন, তবে বাহ্যিকভাবে আমাদের সাথে ছিলে। কিন্তু নিজেদেরকে পরিবেষ্টিত করেছিলে এবং তোমাদের অন্তরগুলো দ্বিধা- দ্বন্দ্ব ও নির্মমতায় জড়িয়ে পড়েছিল। আর অদ্য তোমাদের সকল ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়ে গিয়েছে এবং তোমাদের থেকে ও কাফেরদের থেকে (শাস্তির) বিকল্প হিসেবে কিছুই গ্রহণ করা হবে না। অবশেষে কাফের ও মুনাফিকদেরকে নরক গহ্বরে নিক্ষেপ করা হবে।[৯৭]

যখন বিশ্বাসীগণ বেহেশতের নিকটবর্তী হবে তখন এর দ্বারগুলো খুলে যাবে এবং রহমতের ফেরেশতারা তাদেরকে স্বাগতম জানাতে আসবে। তারা সম্মান ও সালামের সাথে তাদেরকে (মু'মিনগণকে) অনন্তসৌভাগ্যের সুসংবাদ দিবে[৯৮] অপরদিকে যখন কাফের ও মুনাফিকরা দোযখের নিকটবর্তী হবে, তখন এর দ্বারগুলোও খুলে যাবে এবং আযাবের ফেরেশতারা তাদেরকে রূঢ়তাসহকারে ভর্ৎসনা করবে। তারা (আযাবের ফেরেশতারা) অনন্তশাস্তির প্রতিশ্রুতি দিবে।[৯৯]

বেহেশত :

বেহেশতে বিস্তৃত কাননসমূহ, প্রশস্ত আকাশসমূহের ছায়ায়, বিস্তৃত ভূমির উপর অবস্থান করবে, [১০০] যে গুলোতে নানাবিধ বৃক্ষরাজি, সকল প্রকার পরিপক্ক ফল (বেহেশতবাসীর) নাগালের মধ্যে

অবস্থান করবে।[১০১] আর থাকবে আড়ম্বরপূর্ণ ইমারতসমূহ [১০২], স্বচ্ছ পানি[১০৩] এবং পবিত্র পেয়, দুগ্ধ ও মধুর ঝর্ণাধারা ।[১০৪] এ ছাড়া যা কিছুই বেহেশতবাসীর কাংখিত, [১০৫] বরং তাদের যাঞ্ছারও অধিক বৈভবে পরিপূর্ণ থাকবে ঐ বেহেশত ।[১০৬] বেহেশতবাসীগণ বিভিন্ন প্রকার সৌন্দর্য ও চিত্রাংকিত মসৃন রেশমী পোশাকে সজ্জিত হয়ে[১০৭] মণিমুক্তা খচিত আরামদায়ক সুকোমল সজ্জায় পরস্পরের মুখোমুখী অবস্থানে হেলান দিয়ে বসে থাকবে[১০৮] এবং প্রভুর প্রশংসা ও তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে ।[১০৯] অনর্থক কোন কথা বলবে না বা নবে না ।[১১০] হিমেল বা তপ্ত বাতাস কোনটিই তাদেরকে কষ্ট দিবে না ।[১১১] তাদের থাকবে না কোন দুর্ভোগ, ক্লান্তি ও বিষাদ[১১২] কিংবা থাকবে না কোন ভয় ও বেদনা[১১৩] অথবা থাকবে না তাদের কোন হিংসা বা ক্রোধ।[১১৪] সুদর্শন সেবকগণ তাদের চারপাশে পরিভ্রমণরত থাকবে ।[১১৫] স্বর্গীয় সুন্দর পানপাত্র থেকে তাদেরকে পান করানো হবে, যা তাদের বর্ধিত আনন্দ ও উপভোগের কারণ হবে এবং কোন প্রকার র্দুদৈবই তাদেরকে স্পর্শ করবে না ।[১১৬] নানাবিধ ফলমূল ও পাখীর মাংস তারা ভক্ষণ - করবে ।[১১৭] নিষ্কলুষ অপরূপ সুদর্শনা ও দয়াশীলা সঙ্গীগণের কোমল স্পর্শে তারা হবে ধন্য ।[১১৮] সবকিছুর উর্ধ্বে তারা প্রভুর পক্ষ থেকে আত্মিক তুষ্টির মত নেয়ামতের অধিকারী হবে ।[১১৯] তারা তাদের প্রভুর করুণা ও দয়ায় ধন্য হবে, যা তাদেরকে মহার্ঘ্যে নিমজ্জিত করবে এবং কারও পক্ষেই সে আনন্দের সীমা নির্ধারণ করা সম্ভব নয় ।[১২০] আর এ অতুলনীয় সৌভাগ্য, অবর্ণনীয় বৈভব এবং প্রভুর অনুগ্রহ, তুষ্টি ও সান্নিধ্য সর্বদা সেথায় বিরাজ করবে [১২১], যা কখনোই শেষ হবে না ।[১২২]

দোযখ :

দোযখ সে সকল কাফের ও মুনাফিকদের আবাসস্থল, যাদের অন্তরে ঈমানের কোন প্রকার জ্যোতিরই অস্তিত্ব নেই ।[১২৩] আর এ দোযখের ধারণক্ষমতা এত বেশী যে, সমস্ত অন্যায়কারীদেরকে ধারণ করার পরও বলবে 'هذا من مزيد' অর্থাৎ আরও আছে কি ?[১২৪] সেথায় আছে ধু আগুন আর আগুন, শাস্তি আর শাস্তি !

আগুনের লেলিহান শিখাগুলো সবদিক থেকে (জাহান্নামীদেরকে) গ্রাস করবে। আর কর্ণবিদারী, ক্রোধানিত গর্জনে দোযখবাসীর ভয়-ভীতির মাত্রা বৃ পাবে ।[১২৫] কদাকার, ভগ্ন কৃ কায়, কুৎসিৎ চেহারার এ দোযখবাসীরা এমন কি দোযখের ফেরেস্তাদের চেহারায়[১২৬] ও কোন প্রকার দয়া করুনা ও নমনীয়তার ছোঁয়া দেখতে পাবে না ।[১২৭] নরকবাসীরা লোহার গলাবন্ধ, জিঞ্জির দ্বারা বাঁধা থাকবে ।[১২৮] আগুন তাদের আপদমস্তক গ্রাস করবে[১২৯] এবং স্বয়ং তারাই সে আগুনের ইন্ধন হবে ।[১৩০] নরকের এহেন পরিবেশে নরকবাসীদের ক্রন্দন, চিৎকার, আহাজারী এবং নরক প্রহরীদের হুংকার ব্যতীত কিছুই নতে পাওয়া যাবে না।[১৩১] পাপীদের আপদমস্তকে ফুটন্ত পানি ঢালা হবে। ফলে তাদের দেহের অভ্যন্তরভাগও গলে যাবে ।[১৩২] যখনই পিপাসার প্রচণ্ডতা ও প্রদাহে পানি প্রার্থনা করবে তখনই উত্তপ, কলুষিত ও দুর্গন্ধময় পানি তাদেরকে প্রদান করা হবে, যা তারা গোগ্রাসে পান করবে ।[১৩৩] তাদের খাবার হবে যাক্কুম বৃক্ষের ফল, যা আগুন থেকে জন্ম গ্রহণ করে। আর এ ফল ভক্ষণে তাদের অভ্যন্তরের যন্ত্রণা অধিকমাত্রায় বৃ পাবে।[১৩৪] তাদের পোশাক হবে এক প্রকার কৃ কায় পদার্থ থেকে তৈরীকৃত, যা আঠালো এবং তাদের দুর্ভোগবৃ র কারণ হবে ।[১৩৫] তাদের সঙ্গী হবে শয়তান ও পাপিষ্ঠ জীনরা যাদের কাছ থেকে তারা পলায়ন করতে চাইবে ।[১৩৬] আর তারা পরস্পর পরস্পরকে অভিশাপ ও অভিসম্পাত করবে ।[১৩৭]

যখনই তারা মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাইবে, তখন দূর হও, চুপ কর, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাদেরকে স্তব্ধ করে দেয়া হবে ।[১৩৮] অতঃপর দোযখের প্রহরীদের শরণাপন্ন হয়ে বলবে যে , তোমরা আল্লাহর কাছে চাও, যাতে আমাদের শাস্তি কিছুটা হ্রাস করে।" উত্তরে শ্রবণ করবে মহান : আল্লাহ কি নবীগনকে (.আ) প্রেরণ করেননি? এবং তোমাদেরকে কি তারা চূড়ান্ত দলিল প্রদর্শন করেননি ?"[১৩৯]

অতঃপর তারা মৃত্যু কামনা করবে। জবাবে বলা হবে যে, "তোমরা অনন্তঃকাল দোযখে অবস্থান করবে ।[১৪০] যদিও মৃত্যু তাদেরকে সর্বদিক থেকে আগ্রাসন করবে, কিন্তু তারা মরবে না ।[১৪১]

যতবারই তাদের শরীরের চামড়া ঝলসে যাবে, ততবারই নতুন চামড়া সৃষ্টি হবে; আর এ ভাবে তাদের আযাব চলতে থাকবে ।[১৪২]

বেহেশতবাসীদের নিকট থেকে কিঞ্চিৎ পানি ও খাবার ভিক্ষা করলে বলা হবে, 'মহান আল্লাহ বেহেশতের নেয়ামত তোমাদের জন্যে নিষি করেছেন ।[১৪৩] বেহেশতবাসীগণ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের এ দুর্ভাগ্যের কারণ কী এবং কী কারণে তোমাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হয়েছে ? জবাবে দোযখবাসীরা বলবে, আমরা মহান আল্লাহর এবাদত ও সালাত পাঠ করতাম না এবং নিঃস্ব ও দরিদ্রদেরকে সাহায্য করতাম না, পাপীষ্ঠদের সহযোগিতা করতাম, আর কিয়ামতের দিনকে অস্বীকার করতাম ।[১৪৪]

অতঃপর দোযখবাসীরা পরস্পরের সাথে কলহে লিপ্ত হবে ।[১৪৫] বিপথগামীরা, যারা তাদেরকে বিপথগামী করেছে, তাদেরকে বলবে : তোমরাই আমাদেরকে বিপথগামী করেছিলে। তারা জবাবে বলবে : তোমরা স্বেচ্ছায় আমাদেরকে অনুসরণ করেছিলে ।[১৪৬]

অধীনস্থরা ক্ষমতাধরদেরকে বলবে : তোমরাই আমাদের এ হতভাগ্যের জন্যে দায়ী। তারা জবাবে বলবে : আমরা কি তোমাদেরকে জোরপূর্বক তোমাদের সত্য পথ থেকে বিরত রেখেছিলাম ।[১৪৭]

অবশেষে শয়তানকে বলবে : তুই- ই আমাদের বিপথগামীতার কারণ। সে জবাবে বলবে : মহান আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তোমরা তা অগ্রাহ্য করেছ। আর আমি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তোমরা তা গ্রহণ করেছিলে। সুতরাং আমাকে ভৎসনা করার পরিবর্তে, তোমাদের নিজেদেরকে ভৎসনা কর। অদ্য আমরা কেউই কারও উপকারে আসতে পারব না ।[১৪৮]

আর এভাবে নিজেদের কুফরি ও অবাধ্যতার শাস্তি ভোগ ব্যতীত তাদের আর কোন উপায় থাকবে না এবং অনন্তকাল তারা সেথায় আযাব ভোগ করতে থাকবে ।[১৪৯]

১১তম পাঠ

ইহকাল ও পরকালের মধ্যে তুলনা

ভূমিকাঃ

বু‍ি বৃত্তিক ও উ‍ৃ তিগত পথে পরজগতের যে পরিচয় আমরা লাভ করেছি, তার মাধ্যমে পৃথিবী ও আখেরাতকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তুলনা করতে পারি। সৌভাগ্যবশতঃ এ ধরনের তুলনা স্বয়ং পবিত্র কোরানেও সংঘটিত হয়েছে এবং আমরা কোরানের উ‍ৃ তির মাধ্যমে পার্থিব জীবন এবং পরকালীন জীবনের সঠিক মূল্যায়ন করতঃ পরকালীন জীবনের শ্রেষ্ঠত্বকে উপস্থাপন করতে পারি ।

নশ্বর পৃথিবী ও অবিনশ্বর আখেরাত :

পৃথিবী ও আখেরাতের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল পৃথিবীর আয়ুষ্কালের সীমাব তা ও : আখেরাতের চিরন্তনতা। এ পৃথিবীতে সকল মানুষেরই জীবনকালের পরিসমাপ্তি বিদ্যমান যা অতিসত্বর বা অনতিসত্বর ঘটে থাকবেই। এমনকি যদি কেউ শতসহস্র কালও এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকে, তবে অবশেষে এ প্রাকৃতিক বিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি অর্থাৎ যখন প্রথম (نفخ صور اول) ফুৎকার ধ্বনিত হবে, তখনই তার জীবনাবসান ঘটবে, যেমনটি আমরা পূর্ববর্তী পাঠসমূহে জানতে পেরেছি। অপরদিকে কোরানের প্রায় অষ্টাদশ সংখ্যক আয়াত আখেরাতের চিরন্তনতা ও অবিনশ্বরতার প্রমাণ বহন করে।[১৫০] আর এটা সুস্পষ্ট যে, যা নশ্বর তা যত সুদীর্ঘকালই থাকুক না কেন, অবিনশ্বরের সাথে তার কোন তুলনা হতে পারে না ।

অতএব পরজগত অমরত্ব ও চলি ‍ুতার দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর উপর এক বিরাট শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। এই বিষয়টিই পবিত্র কোরানের একাধিক আয়াতে পরকালের আবকা (ابقی) অর্থে

উল্লেখিত হয়েছে।[১৫১] এছাড়া পৃথিবীর কালিল(قليل) অর্থাৎ অতি সামান্য হওয়ার কথাও স্মরণ করা হয়েছে।[১৫২] অপর কিছু আয়াতে পার্থিব জীবনকে ঐ সকল উদ্ভিদের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যেগুলো কেবলমাত্র অতিক্ষুদ্র সময়ের জন্যে সবুজ ও মনোরম হয়, অতপর হলুদাভ ও বিবর্ণরূপ ধারণ করে এবং অবশেষে ক্ষ ও লীন হয়ে যায়।[১৫৩] এছাড়া একটি আয়াতে সামগ্রিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে :

(مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ)

তোমাদের নিকট যা আছে তা নিঃশেষ হবে এবং আল্লাহর নিকট যা আছে তা স্থায়ী। (নাহল - ৯৬)

আখেরাতের আযাব থেকে নেয়ামতের পৃথকীকরণ :

পার্থিব জীবন ও পরকালীন জীবনের মধ্যে অপর মৌলিক পার্থক্যটি হল : পার্থিব সুখ- সমৃ কষ্ট ও ক্লেশমিশ্রিত এবং এমনটি নয় যে, এক শ্রেণীর মানুষ সর্বদা সর্বাবস্থায় নেয়ামতের অধিকারী হবে এবং সদানন্দ বিহারে জীবনাতিবাহিত করবে ; আর অপর একশ্রেণীর মানুষ সর্বদা কষ্টক্লিষ্ট জীবন যাপন করবে; বরং সকলেই একদিকে যেমন কমবেশী আনন্দ ও ভোগ- বিলাসের অধিকারী অপরদিকে তেমনি কষ্ট, ক্লেশ ও উদ্বেগেরও অধিকারী। কিন্তু পরজগৎ দু'টি স্বতন্ত্র (বেহেশত ও দোযখ) ভাগে বিভক্ত। একাংশে কষ্ট- ক্লেশ ও ভয়- ভীতির লেশমাত্র নেই। আর অপরাংশে ব্যথা, বেদনা, অগ্নিযন্তনা, ভয়- ভীতি ব্যতীত অন্য কিছুর অস্তিত্ব নেই। স্বভাবতঃই আখেরাতের ভোগ- বিলাসে ও কষ্ট- ক্লেশ পৃথিবীর তুলনায় চুড়ান্ত মাত্রায় পরিলক্ষিত হবে।

এধরনের মূল্যায়নও পবিত্র কোরানে উ ্ ত হয়েছে। আর পরকালীন নেয়ামত এবং প্রভুর সান্নিধ্য ও নৈকট্যের শ্রেষ্ঠত্ব, পার্থিব নেয়ামতের তুলনায় অধিক গুরুত্ব পেয়েছে; [১৫৪] যেমনকরে পরকালীন আযাব ও কষ্ট -ক্লেশ, পার্থিব কষ্ট -ক্লেশের চেয়ে অধিক বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[১৫৫]

আখেরাতই মূল :

পৃথিবী ও আখেরাতের মধ্যে অপর গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যটি হল : পার্থিব জীবন, আখেরাতের সূচনাস্বরূপ এবং অনন্ত সৌভাগ্য লাভের মাধ্যম। আর পরকালীন জীবনই হল চূড়ান্ত ও মূল জীবন, যদিও পার্থিব জীবন ও এতে বিদ্যমান ব গত ও অব গত নেয়ামতসমূহ মানুষের জন্যে জরুরী, কিন্তু যেহেতু এর সবগুলোই হল পরীক্ষাস্বরূপ এবং সত্যিকারের উৎকর্ষ ও অনন্ত সুখ-সমৃ অর্জনের মাধ্যম, তাই এর কোন মৌলিকত্ব নেই। পার্থিব নেয়ামতসমূহের প্রকৃত মূল্যমান ঐ সকল রসদের উপর নির্ভরশীল, যেগুলো কোন ব্যক্তি অনন্ত জীবনের জন্যে সংগ্রহ করে থাকে।[১৫৬]

অতএব, যদি কেউ পরকালীন জীবনকে বিস্মৃত হয় এবং পার্থিব রূপ- যৌলুসের উপরই আপন দৃষ্টি নিব করে, কিংবা এ জীবনের ভোগ- বিলাসকেই চূড়ান্ত লক্ষ্যরূপে নির্ধারণ করে তবে সে এর প্রকৃত মূল্যায়নে ব্যর্থ হয়েছে এবং এর জন্যে ভ্রান্ত মূল্যমান নির্ধারণ করেছে। কারণ সে মাধ্যমকেই চূড়ান্ত লক্ষ্যরূপে চিহ্নিত করেছে। আর এ ধরনের কর্মের অর্থ ক্রীড়া- কৌতুক ও প্রতারিত হওয়া বৈ কিছুই নয়। এ কারণেই পবিত্র কোরান পার্থিব জীবনকে ক্রীড়া- কৌতুক ও প্রতরণার মাধ্যম হিসেবে আখ্যায়িত করেছে[১৫৭] এবং পরকালীন জীবনকে প্রকৃত জীবন বলে গণনা করেছে।[১৫৮] কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, পৃথিবীর প্রতি যে সকল ভৎসনা নিক্ষিপ্ত হয়েছে তার অধিকাংশই হল দুনিয়া পূজারী মানুষেরই এক ধরনের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির ফল। নতুবা পার্থিব জীবন আল্লাহর যোগ্য মানুষ যারা এর বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত এবং একে মাধ্যমে হিসেবে গণনা করেন ও স্বীয় জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অনন্তসৌভাগ্য অর্জনের পথে নিয়োগ করেন, তারা এ পার্থিব জীবনকে ভৎসনাতো করেনই না বরং এর জন্যে অভূতপূর্ব মূল্যমান নির্ধারণ করে থাকেন।

পার্থিব জীবনকে নির্বাচনের পরিণতি :

পরকালীন জীবনের বিশেষত্ব ও পার্থিব ভোগ- বিলাসের উপর স্বর্গীয় নেয়ামতসমূহের অবর্ণনীয় শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রভুর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্যের কথা বিবেচনা করলে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, পরকালীন

জীবনের পরিবর্তে পার্থিব জীবনকে নির্বাচন করা কখনোই বু িমানের কাজ হতে পারে না।[১৫৯] আর এর ফলশ্রুতি দুর্ভোগ ও দূঃখ ব্যতীত কিছুই নয়। কিন্তু এ ধরনের নির্বাচনের কদর্যতা ও অসারতা তখনই অধিকতর প্রকাশ লাভ করে যখন জানব যে, পৃথিবী ও এর ভোগ-বিলাসের প্রতি আকর্ষণ, কেবলমাত্র অনন্ত সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়ারই কারণ নয় বরং চিরন্তন দুর্ভোগেরও গুরুতর কারণ।

এর ব্যাখ্যা এরূপ : যদি মানুষ অনন্ত সুখ-সমৃ ির পরিবর্তে দ্রুত অপসৃয়মান পার্থিব ভোগ-বিলসকে এমনভাবে নির্বাচন করতে পারত যে, চিরন্তন জীবনের জন্যে এর কোন বিরুপ প্রভাব থাকবে না, তারপরও পরকালীন সুখ-সমৃ ির সীমাহীন অগ্রাধিকারের কথা বিবেচনা করলে এ ধরনের কর্ম, নির্বু িতার পরিচয় বহন করত। তদুপরি অনন্ত জীবন থেকে কেউই পলায়ন করতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি পার্থিব জীবনের জন্যেই তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে এবং পরকালীন জগৎকে ভুলে গিয়েছে কিংবা অস্বীকার করেছে, তবে সে কেবল স্বর্গীয় বৈভব থেকেই বঞ্চিত হবে না বরং চিরকালের জন্যে সে নরকযন্ত্রণা ভোগ করবে এবং অধিকমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[১৬০]

এ কারণে পবিত্র কোরান একদিকে পরকালীন নেয়ামতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করে এবং সতর্ক করে দেয়, যাতে পার্থিব জীবন তাকে প্রতারিত না করতে পারে।[১৬১] আবার অপরদিকে পৃথিবীর প্রতি আসক্তি ও আখোরাতকে ভুলে যাওয়া কিংবা অস্বীকার করা অথবা এ সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার নির্মম পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করে এবং সতর্ক করে দেয় যে, এহেন কর্ম চিরন্তন দুর্দশা ও দুর্ভোগের কারণ হয়ে থাকে ।[১৬২] আর এমনটি নয় যে, পৃথিবীকে নির্বাচনকারী পরকালীন পুরস্কার থেকেই কেবলমাত্র বঞ্চিত হবে বরং এ ছাড়াও সে অনন্ত শাস্তিতেও পতিত হবে।

এর নিগূঢ় তথ্য হল এখানে : দুনিয়াপূজারী, মহান আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতাসমূহকে বিনষ্ট করেছে। আর যে বৃক্ষ অনন্তসৌভাগ্যের ফলধারণ ক্ষমতাকে ক্ষ ও নিষ্ফল করে ফেলেছে এবং প্রকৃত বৈভবদাতার অধিকারকে (আল্লাহর উপাসনা) ক্ষুন্ন করেছে, তার প্রদত্ত নেয়ামতকে তারই অসন্তুষ্টির পথে ব্যয় করেছে, এহেন ব্যক্তিই যখন তার মন্দ ও ভ্রান্ত মনোনের ফল দেখতে

পাবে, তখন এ প্রত্যাশ্য করবে যে, হায় যদি মৃত্তিকা হতাম! তবে এ নির্মম পরিণতির শিকার হতাম না ।[১৬৩]

১২তম পাঠ

দুনিয়া ও আখেরাতের সম্পর্ক

ভূমিকা :

ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি যে, মানুষের জীবন কেবলমাত্র দ্রুত অপসৃয়মান এ পার্থিব জীবনের মধ্যেই সীমাব নয় বরং পুনরায় পরকালে জীবন লাভ করবে এবং চিরকাল সেথায় বেঁচে থাকবে। অনুরূপ জানতে পেরেছি যে, পরকালীন জীবনই হল প্রকৃত ও সত্যিকারের জীবন। মূলতঃ পার্থিব জীবন এদিক থেকে পরকালীন জীবনের তুলনায় জীবন নামকরণেরই অযোগ্য। এমন নয় যে, পরকালীন জীবনের অর্থ ভাল বা মন্দ নাম অথবা কাল্পনিক বিষয় বা কোন সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত বিষয়।

এখন পার্থিব ও পরকালীন জীবনের মধ্যে তুলনা ও এতদুভয়ের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতি নির্ধারণের পালা এসেছে। তবে পূর্ববর্তী পাঠসমূহের আলোচনা প্রসঙ্গে এ সম্পর্কের প্রকৃতি কিছুটা হলেও প্রতীয়মান হয়েছে। কিন্তু বিদ্যমান নানাবিধ বক্রচিন্তার কথা বিবেচনা করে এ বিষয়ের উপর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা প্রয়োজন মনে করছি। আর বু বৃত্তিক দলিলসমূহ ও কোরানের বক্তব্যসমূহের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান, তা পরিষ্কার হওয়া জরুরী ।

দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র :

এখানে যে বিষয়টি সর্বাধিক গুরুতের সাথে বিবেচনা করতে হবে, তা হল : পরকালীন জীবনের সুঃখ, দুঃখ পৃথিবীতে মানুষের আচার- ব্যবহারের অনুগামী। এমনটি নয় যে, পরকালীন বৈভব অর্জনের জন্যে ঐ জগতেই চেষ্টা ও শ্রম ব্যয় করতে হবে এবং যারা অধিক দৈহিক শক্তি ও তীক্ষ্ণচিন্তার অধিকারী, তারা অধিক নেয়ামত ভোগ করতে পারবেন অথবা কেউ কেউ প্রতারণার

মাধ্যমে অপরের অর্জিত বৈভব অপব্যবহার করতে পারবেন; যেমনটি কোন কোন নির্বোধ ব্যক্তি ধারণা করে এবং পরজগৎকে পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন বলে মনে করে।

পবিত্র কোরানের ভাষায় কোন কোন কাফেরের উ ৃ তি তুলে ধরা হয়েছে :

(وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا)

(দুনিয়াপূজারী ব্যক্তি বলল) আমি মনে করি না যে, ক্বিয়ামত হবে, আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হই- ই, তবে আমি তো নিশ্চয়ই এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব। (কাহ্ফ- ৩৬)

অন্য এক প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

(وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى)

আমি মনি করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে, আর আমি যদি আমার প্রতি পালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হই- ও, তার নিকট তো আমার জন্যে কল্যাণই থাকবে। (ফুসসিলাত- ৫০)

এ ধরনের ব্যক্তিরা মনে করেছেন যে, পরকালীন জীবনেও পৃথিবীর মতই স্বীয় চেষ্টায় অসংখ্য নেয়ামতের অধিকারী হতে পারবেন অথবা ধারণা করেছেন যে, এ পার্থিব জীবনে সুখ- সমৃ ি র অধিকারী হওয়া, তার প্রতি মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের নিদর্শন, সুতরাং পরকালেও এ ধরনের অনুগ্রহেরই অধিকারী হবেন !

যা হোক যদি কেউ পরকালীন জগৎকে পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন জগতরূপে বিবেচনা করে থাকেন এবং পৃথিবীতে যে সুকর্ম ও দুষ্কর্ম সম্পাদন করেছেন আখেরাতের নেয়ামত ও শাস্তির জন্যে এর কোন প্রভাব আছে বলে মনে না করেন তবে যে পরকাল সকল ঐশী ধর্মেরই মৌলিক বিশ্বাস, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেননি। কারণ এ মূলনীতিটি পার্থিব জগতে সম্পাদিত কর্মের পুরস্কার ও শাস্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকেই পৃথিবীকে আখেরাতের বাজার বা আখেরাতের শস্যক্ষেত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়। সুতরাং এখানে শ্রম দিতে হবে, বীজ বপন

করতে হবে, প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং ফসল ও সম্পদ পরজগতে লাভ করতে হবে।[১৬৪] পুনরুত্থানের স্বপক্ষে উপস্থাপিত দলিলের দাবী এবং কোরানের বক্তব্যও তা- ই, যার জন্যে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

পার্থিব বৈভবসমূহ পরকালীন সুখ- সমৃদ্ধির কারণ নয় :

কেউ কেউ মনে করেন যে, ধন- সম্পদ, সন্তান- সন্তুতি ও অন্যান্য পার্থিব আরাম, আয়াশের উপকরণ, আখেরাতেও সুখ- সমৃ ি র কারণ হবে এবং সম্ভবতঃ মৃতদের সাথে স্বর্ণ, রৌপ্য ও মূল্যবান পাথরসমূহ, এমনকি খাদ্যসমাগ্রী সমাধিস্থকরণের ব্যাপারটি এ ধরনের চিন্তা- ভাবনা থেকেই উৎসারিত।

পবিত্র কোরান গুরুত্বারোপ করে যে, ধন- দৌলত, সন্তান- সন্ততি স্বয়ং (তাদের কাজ- কর্ম বিবেচনা না করে) মহান আল্লাহর নৈকট্যের কারণ হবে না, [১৬৫] বা পরকালে কাউকে লাভবান করবে না।[১৬৬] মূলতঃ এ ধরনের পার্থিব সম্পর্ক ও উপকরণ পরকালে ছিন্ন ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে[১৬৭] প্রত্যেকেই স্বীয় ধন- সম্পদ ত্যাগ করবে[১৬৮] এবং সম্পূর্ণ একাকীই মহান আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে।[১৬৯] কেবলমাত্র আত্মিক ও ঐশি সম্পর্কই প্রতিষ্ঠিত থাকবে । সুতরাং যে সকল মু'মিন তাদের স্ত্রী, সন্তান ও আত্মীয়- স্বজনদের সাথে ঈমানী সম্পর্ক স্থাপন করে থাকেন, তারা বেহেশতে একত্রে বসবাস করবেন ।[১৭০]

অতএব উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, পৃথিবী ও আখেরাতের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক পার্থিব বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের মত নয় এবং এমনটি নয় যে, যে কেউ পৃথিবীতে ক্ষমতা ও শক্তিধর, সুন্দর, প্রফুল্ল, ভাগ্যবান ও অনন্দচিত্তের অধিকারী, তিনি পরকালে ও সেরকমই পরিগণিত হবেন। নতূবা ফেরাউন ও কারুনরা অধিকতর পরকালীন সুখ- সমৃ ি র অধিকারী হওয়াই যুক্তিসঙ্গত হত। বরং যারা পৃথিবীতে অক্ষম, দরিদ্র, কষ্ট- ক্লীষ্ট জীবন- যাপন করেন কিন্তু প্রভুর প্রতি সকল দায়িত্ব সম্পাদন করেন, তারা পরকালে সবল, সুন্দর, সক্ষম বলে পরিগণিত হবেন এবং অনন্ত বৈভবের অধিকারী হবেন।

(وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا)

আর যে ব্যক্তি এখানে অন্ধ, সে আখিরাতেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট। (ইসরা- ৭২)

কোন কোন ব্যক্তি ধারণা করেছেন : উপরোল্লিখিত আয়াতটি দলিল প্রদর্শন করে যে, পার্থিব সুস্থতা ও সৌভাগ্য পরকালীন সুস্থতা ও সৌভাগ্যের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু তারা ভুলে গিয়েছেন যে, উপরোক্ত আয়াতে অন্ধতের মানে বাহ্যিক চক্ষুর অন্ধত্ব নয় বরং এর অর্থ হল অন্তরচক্ষুর অন্ধত্ব। যেমন : অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে :

(فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ)

ব তঃ চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়। (হাজ্জ- ৪৬)

অপর এক স্থানে এসেছে :

(وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا)

যে আমার স্মরণে বিমুখ তাহার জীবন- যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে ক্বিয়ামতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান। তিনি বলবেন, 'এরূপই আমার নিদর্শনাবলী তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবে আজ তুমিও বিস্মৃত হলে। (তোহা- ১২৪-১২৬)

অতএব পরকালে অন্ধতের কারণ হল, ইহকালে মহান আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে বিস্মৃত হওয়া, বাহ্যিকচক্ষুর অন্ধত্ব নয়। সুতরাং ইহ ও পরকালের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক, কারণ ও কার্যের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের মত নয়।

পার্থিব বৈভবসমূহ পরকালীন দুর্দশার কারণও নয় :

অপরদিকে কেউ কেউ ধারণা করেছেন যে, পার্থিব বৈভব ও পরকালীন বৈভবের মধ্যে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক বিদ্যমান এবং তারাই পরকালীন সুখ- সমৃ ি র অধিকারী হবেন, যারা পার্থিব বৈভব থেকে বঞ্চিত ছিলেন। বিপরীতক্রমে যারা পার্থিব নেয়ামতসমূহের অধিকারী, তারা পরকালীন সুখ- সমৃ ি থেকে বঞ্চিত হবেন। প্রাগুক্ত ধারণাপোষণকারীরা ঐ সকল আয়াতের শরণাপন্ন হয়েছেন, যেগুলো এ যুক্তি প্রদর্শন করে যে, দুনিয়াপূজারীরা পরকালীন সুখ- সমৃ ি থেকে বঞ্চিত হবে।[১৭১] তারা ভুলে গিয়েছেন যে, দুনিয়াপূজারী হওয়া আর পার্থিব নেয়ামতের অধিকারী হওয়া সমান কথা নয়। বরং দুনিয়াপূজারী সে- ই, যে পার্থিব ভোগ- বিলাসকে স্বীয় প্রচেষ্টার লক্ষ্যরূপে স্থির করেছে এবং এগুলো লাভ করার জন্যেই সর্বশক্তি নিয়োগ করে থাকে। যদিও নিজের চাওয়া- পাওয়া ও লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়ে থাকে। অপরদিকে পরকালপিয়াসু হলেন তিনিই, পার্থিব ভোগ- বিলাসের প্রতি যার হৃদয় লালায়িত নয় এবং তার লক্ষ্য হল পরকালীন সুখ- সমৃ ি , যদিও ইহকালে প্রাচুর্যের অধিকারী হয়ে থাকেন। যেমনঃ হযরত সুলাইমান (আ.), আল্লাহর অনেক ওলী ও নবীগণ (আ.) পার্থিব প্রাচুর্য ও নেয়ামতের অধিকারী ছিলেন কিন্তু এগুলোকে পরকালীন সুখ- সমৃ ি ও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে ব্যয় করেছেন।

অতএব পার্থিব বৈভব থেকে লাভবান হওয়া ও পরকালীন বৈভব থেকে ভোগ করার মধ্যে যেমনি কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, তেমনি কোন ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক ও নেই। বরং পার্থিব সৌভাগ্য ও সুখ- সমৃ ি এবং দুঃখ- দুর্দশা উভয়ই প্রভুর প্রজ্ঞার ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে[১৭২] আর এগুলোর সবকিছুই হল তার পরীক্ষার উপকরণ ।[১৭৩]

সুতরাং পার্থিব নেয়ামত থেকে বঞ্চিত বা লাভবান হওয়া, স্বয়ংক্রিয় ভাবে প্রভুর নৈকট্য বা প্রভুর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হওয়া অথবা পরকালীন সৌভাগ্য বা দুর্ভাগের কোন নিদর্শন নয়।[১৭৪]

উপসংহার :

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সি ান্তে পৌঁছতে পারি যে, পৃথিবী ও আখেরাতের মধ্যে বিদ্যমান সকল প্রকার সম্পর্ককে অস্বীকার করার অর্থ হল পুনরুত্থানকে অস্বীকার করা । অথচ পার্থিব নেয়ামত ও পরকালীন নেয়ামতের মধ্যে যেমন কোন সম্পর্ক নেই, তেমনি পার্থিব নেয়ামত ও পরকালীন শাস্তির মধ্যেও কোন সম্পর্ক নেই, অনুরূপ এর বিপরীত ক্ষেত্রেও। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, পৃথিবী ও পরজগতের সম্পর্ক, পার্থিব বিষয়ব সমূহের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের মত নয় কিংবা এ সম্পর্ক পদার্থ ও জীববিদ্যার কোন নিয়ম- কানুনের মধ্যেও পড়ে না। বরং যা পরকালীন সুখ- সমৃ অথবা শাস্তির কারণ, তা হল : পৃথিবীতে মানুষের স্বাধীন নির্বাচনাধীন কর্মকাণ্ড। তা- ও কেবলমাত্র শক্তি- সামর্থ্য ব্যয় এবং ব গত পরিবর্তন সংঘটনের দৃষ্টিকোণ থেকে নয় বরং তা, ঈমান ও কুফরের দৃষ্টিকোণ থেকে উৎসারিত হয়। আর এ কারণেই পবিত্র কোরানে পরকালীন সুখ- সমৃ কে, মহান আল্লাহর প্রতি, পুনরুত্থান দিবসের প্রতি ও নবীগণের (আ.) প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের এবং আল্লাহর তুষ্টিযুক্ত কর্মকাণ্ড সম্পাদনের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে গণনা করা হয়েছে। যেমন : নামাজ, রোজা, জিহাদ, আল্লাহর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ ও দান, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ অত্যাচারী কাফেরদের বিরু সংগ্রাম, ন্যায় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি হল মহান আল্লাহর পছন্দনীয় কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে পরকালীন অনন্ত আযাব বা শাস্তি ভোগের কারণ হল কুফর, শিরক, অন্যায়কর্ম সম্পাদন, কিয়ামত ও নবীগণকে অস্বীকার করা এবং বিভিন্ন প্রকার অত্যাচার ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি। এ ছাড়া অসংখ্য আয়াতে সামগ্রীকভাবে পরকালীন সুখ- সমৃ র কারণরূপে বিশ্বাস ও সৎকর্ম সম্পাদন ”[১৭৫] এবং দুর্দশার কারণরূপে “কুফর ও পাপাচারের ” কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১৭৬]

১৩তম পাঠ

ইহ ও পরকালের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতি

ভূমিকা :

ইতিমধ্যেই আমরা জেনেছি যে, একদিকে ঈমান ও সৎকর্ম এবং অপরদিকে প্রভুর সান্নিধ্য ও পরকালীন নেয়ামতসমূহের মধ্যে, প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান। অনুরূপ একদিকে কুফর ও পাপাচার এবং অপরদিকে প্রভুর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হওয়া ও অনন্ত নেয়ামতসমূহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান । আবার ঈমান ও সৎকর্ম, পরকালীন শাস্তির সাথে এবং কুফর ও পাপাচার চিরস্থায়ী নেয়ামতসমূহের সাথে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক রক্ষা করে। এ সম্পর্কসমূহের মূলনীতি সম্পর্কে কোরানের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই এবং এগুলোকে অস্বীকার করার অর্থ হল কোরানকে অস্বীকার করার শামিল।

তবে এ জরুরী বিষয়টি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারণা হয়। ফলে এ সম্পর্কে আলোচনা ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন। যেমনঃ বর্ণিত সম্পর্কগুলো কি বাস্তব ও সুনির্ধারিত সম্পর্ক, না কি কেবলমাত্র কল্পিত বা স্বীকৃত সম্পর্ক ? ঈমান ও সৎকর্ম এবং তদনুরূপ কুফর ও পাপাচারের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কি ? স্বয়ং সৎকর্ম ও কুকর্ম পরস্পরের উপর কোন প্রভাব ফেলে কি ?

আলোচ্য পাঠে প্রথম প্রশ্নটির উপর আলোচনা করতঃ ব্যাখ্যা করব যে, উপরোল্লিখিত সম্পর্কসমূহ কোন কৃত্রিম ও স্বীকৃতমূলক সম্পর্ক নয়।

বাস্তব সম্পর্ক না কি স্বীকৃতমূলক সম্পর্ক :

ইতিপূর্বে আমরা একাধিকবার আলোচনা করেছি যে, পার্থিব কর্মকাণ্ড ও পরকালীন নেয়ামত ও শাস্তির মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক, ব গত ও সাধারণ সম্পর্কের মত নয় এবং একে

পদার্থগত, রাসায়নিক ইত্যাদি কোন নিয়মের আলোকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষন করা সম্ভব নয়। এমনকি বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পাদনে মানুষের যে শক্তি ব্যয় হয়, শক্তি ও ব র নিত্যতা সূত্র মতে এরা পরস্পর পরিবর্তিত হয় এবং পরকালীন নেয়ামত ও শাস্তিরূপে প্রকাশ লাভ করে - এমনটি ধারণা করাও ঠিক নয় । কারণ :

প্রথমতঃ একজন মানুষের কথা ও কর্মে ব্যবহৃত শক্তি সম্ভবতঃ এমন পরিমাণেও হবে না যে, একটি আপেলের বীজে পরিবতির্ত হতে পারে, অগণিত বেহেশতী নেয়ামত তো দূরের কথা ।

দ্বিতীয়তঃ ব ও শক্তির পরিবর্তন, বিশেষ কারণানুসারে সম্পন্ন হয় এবং সুকর্ম, দুষ্কর্ম ও কর্তার নিয়্যাতের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এ ছাড়া কোন প্রাকৃতিক নিয়মের ভিত্তিতেই আন্তরিকতাপূর্ণ ও ভণ্ডামীপূর্ণ কর্মের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা সম্ভাব নয়, যাতে করে বলা যাবে যে, কারো শক্তি নেয়ামতে, আবার কারও শক্তি শাস্তি বা আযাবে পরিণত হয়।

তৃতীয়তঃ যে শক্তি একবার ইবাদতের পথে ব্যয় হয়, অন্যবার সে শক্তি পাপাচারেও ব্যয় হতে পারে।

কিন্তু এ ধরনের সম্পর্ককে অগ্রাহ্য করার অর্থ চূড়ান্তরূপে বাস্তব সম্পর্ককে অস্বীকার করা নয়। কারণ অজ্ঞাত ও অভিজ্ঞতা বিবর্জিত সম্পর্কও বাস্তব সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান যেমনিকরে পার্থিব ও পরকালীন বিষয়সমূহের সাথে কার্যকারণগত সম্পর্ককে প্রমাণ করতে অক্ষম, তেমনি এ গুলোর মধ্যে বিদ্যমান কার্য ও কারণগত সম্পর্ককে অস্বীকার করতেও অপারগ। অপরদিকে এরূপ ধারণা করা যে, সৎকর্ম ও দুষ্কর্ম মানুষের আত্মার উপর সত্যিকারের প্রভাব ফেলে এবং এ আত্মিক প্রভাবই পরকালীন নেয়ামত ও শাস্তি লাভের কারণ হয়, (যেমন : পার্থিব অলৌকিক বিষয়ের উপর কোন কোন আত্মার প্রভাব) তবে তা অযৌক্তিক নয়। বরং বিশেষ দার্শনিক নীতির মাধ্যমে তা প্রমাণ করা সম্ভব। তবে এ গুলোর আলোচনা এ পুস্তকের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কোরানের বক্তব্য:

কোরানের বক্তব্যসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে, আমাদের মস্তিষ্কে কৃত্রিম ও স্বীকৃত সম্পর্কেরই প্রতিফলন ঘটে। যেমন : প্রতিদান ও শাস্তি সম্পর্কিত আয়াতসমূহ ।[১৭৭] কিন্তু অন্যান্য আয়াতের সাহায্য নিয়ে বলা যায় যে, মানুষের কর্মকাণ্ড ও পরকালীন পুরষ্কার ও শাস্তির মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক স্বীকৃত সম্পর্কের উর্ধ্বে। অতএব আমরা বলতে পারি যে, প্রথম শ্রেণীর ব্যাখ্যা সহজবোধ্য এবং যেখানে অধিকাংশ মানুষের অবস্থা বিবেচনা করা হয়েছে, যাদের মস্তিষ্ক এ ধরনের অর্থ বা তাৎপর্যের সাথে পরিচিত।

অনুরূপ হাদীস শরীফেও এমন অসংখ্য সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে যে, মানুষের স্বাধীন নির্বাচনাধীন কর্মকাণ্ডসমূহ একাধিক মালাকুতী রূপ পরিগ্রহ করে, যে গুলো বারযাখে ও কিয়ামতে প্রকাশ লাভ করবে।

এখন আমরা যে সকল আয়াত, মানুষের কর্মকাণ্ডের সাথে পরকালীন প্রতিদানের বাস্তব সম্পর্কের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে, সেগুলো উপস্থাপন করব :

(وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ)

তোমরা উত্তম কাজের যা কিছু নিজেদের জন্যে প্রেরণ করবে আল্লাহর নিকট তা পাবে। (বাকারা- ১১০) { এ ছাড়া সূরা মুযাম্মিল - ২০ দ্রষ্টব্য }

(يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا)

যে দিন প্রত্যেকে, সে যে ভাল কাজ করেছে এবং সে যে মন্দ কাজ করেছে তা পাবে, সে দিন সে নিজের ও তার মধ্যে দূর ব্যবধান কামনা করবে। (আলে ইমরান- ৩০)

(يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ)

সেই দিন মানুষ তার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে। (নাবা- ৪০)

(فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)

কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখবে। যিলযাল (৭- ৮)

(هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)

তোমরা যা করতে তার প্রতিফল ব্যতীত কিছুই তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে কি? (নামল- ৯০){ অনুরূপ কাসাস - ৮৪ দ্রষ্টব্য }

)إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا(

যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে। (নিসা- ১০)

স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ পরকালে দেখবে যে, পৃথিবীতে কি কি কর্মকাণ্ড সম্পাদন করেছে, কেবলমাত্র তা- ই তাদের পুরস্কার ও শাস্তি নয়। বরং এগুলো হল মালাকুতি পাপসমূহ, যেগুলো বিভিন্ন নেয়ামত ও শাস্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করবে এবং ব্যক্তি ঐগুলোর মাধ্যমে নেয়ামত ও আযাব লাভ করবে। যেমন : শেষোক্ত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অনাথের সম্পদ ভক্ষণের অব্যক্ত রূপ হল অগ্নি ভক্ষণ করা এবং যখন অপর এক জগতে সকল বাস্তবতা ও সত্য আত্মপ্রকাশ করবে, তখন দেখতে পাবে যে, কোন হারাম খাবারের অব্যক্তরূপ ছিল অগ্নি। ফলে তখন অভ্যন্তরভাগে এর জ্বালা যন্ত্রণা সে অনুভব করবে এবং তাকে বলা হবে : ওহে, এ অগুন সে হারাম সম্পদ ব্যতীত কিছু কি যা ভক্ষণ করেছিলে ?!

১৪তম পাঠ

অনন্ত সুখ ও দুঃখের ক্ষেত্রে ঈমান ও কুফরের ভূমিকা

ভূমিকা :

অপর প্রশ্নগুলো হল এই যে, ঈমান ও সৎকর্ম উভয়েই কি অনন্ত সুখ- সমৃ ি র পথে পরস্পর স্বতন্ত্র কোন নির্বাহী না কি সম্মিলিতভাবে অনন্তসৌভাগ্য ও সুখ- সমৃ ি র কারণ? অনুরূপ কুফর ও পাপাচারের প্রত্যেকটিই কি স্বতন্ত্রভাবে চিরন্তন শাস্তির কারণ না কি সম্মিলিতভাবে এ ধরনের প্রভাব ফেলে ? দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যদি কেউ কেবলমাত্র ঈমানের অধিকারী হয় অথবা সৎকর্ম সম্পন্ন করে থাকে, তবে তার বিচার কিরূপ হবে? তদনুরূপ যদি কেউ ধুমাত্র কুফরি করে থাকে অথবা পাপাচারে লিপ্ত হয় তবে তার ভাগ্যে কি ঘটবে ? যদি কোন বিশ্বাসী ব্যক্তি একাধিক পাপাচারে লিপ্ত হয় অথবা কোন অবিশ্বাসী ব্যক্তি একাধিক সুকর্ম সম্পাদন করে থাকে, তবে সে কি সৌভাগ্য বা সুখ- সমৃ ি র অধিকারী হবে, না কি দুঃখ- দুর্দশায় পতিত হবে ? উভয়ক্ষেত্রেই যদি কেউ স্বীয় জীবনের কিছু অংশ বিশ্বাস ও সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে এবং অপর কিছু অংশ কুফর ও পাপাচারের মাধ্যমে অতিবাহিত করে, তবে তার বিচার কি হবে ?

উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো ইসলামের আবির্ভাবের প্রথম শতাব্দীতে আলোচ্য বিষয়ভুক্ত ছিল। খাওয়ারেজের মত কেউ কেউ বিশ্বাস করত যে, পাপাচারে লিপ্ত হওয়া অনন্ত দুঃখ- দুর্দশার জন্যে স্বাধীন নির্বাহী, যা অধিকিন্তু কুফর ও ধর্ম ত্যাগের কারণও বটে। মুরজিয়াহদের মত অপর একদল বিশ্বাস করেছিলেন যে, অনন্ত সুখ- সমৃ ি র জন্যে ঈমান থাকাই যথেষ্ট এবং পাপাচারে লিপ্ত হওয়া বিশ্বাসীদের অনন্ত সৌভাগ্যের পথে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করে না।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হল : সকল পাপই কুফর ও অনন্ত দুঃখ- দুর্দশার কারণ নয়, যদিও পুঞ্জীভূত পাপ, ঈমান হরণের কারণ হতে পারে। অপরদিকে এমনটি নয় যে, ঈমানের উপস্থিতিতে সকল পাপ ক্ষমা এবং কোন প্রকার অপপ্রভাব তাতে থাকবে না।

আমরা আলোচ্য পাঠে প্রথমেই ঈমান ও কুফরের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করব। অতঃপর অনন্ত সুখ ও দুঃখের পথে এগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করব এবং অপরাপর বিষয়গুলো সম্পর্কে পরবর্তী পাঠসমূহে বর্ণনা করব।

ঈমান ও কুফরের স্বরূপ :

ঈমান হল অন্তর ও আত্মার এক বিশেষ অবস্থা, যা এক ভাবার্থ বা প্রবৃত্তি সম্পর্কে অবগত হওয়ার ফলে অর্জিত হয় এবং এতদ্ভয়ের প্রত্যেকটির তীব্রতা ও ক্ষীণতার কারণে আত্মা যথাক্রমে উৎকর্ষ বা বিকাশ ও অপূর্ণতা পরিগ্রহ করে। যদি মানুষ কোন কিছুর অস্তিত্ব (যদিও তা হয় আনুমানিক রূপে) সম্পর্কে অবগত না হয়ে থাকে, তবে সে এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না। তবে ঐ বিষয় সম্পর্কে কেবলমাত্র জ্ঞান ও অবগতিই যথেষ্ট নয়। কারণ এমনও হতে পারে যে ঐ বিষয় ও এর অবিয়োজ্য বিষয়সমূহ তার হৃদয়গ্রাহী হবে না বরং তা তার প্রবনতার বিপরীত হবে; ফলে ঐ বিষয় সংশ্লিষ্ট বিষয় কার্যকর করণের সি ান্ত গ্রহণ করবে না এবং এমনকি এর পরিবর্তে বিপরীতধর্মী সি ান্ত ও গ্রহণ করতে পারে। যেমনঃ পবিত্র কোরান ফেরাউনিদের সম্পর্কে বলে :

(وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا)

তারা অন্যায় ও উ তভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এইগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। (নামল- ১৪)

এবং হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনকে উদ্দেশ্য করে বললেন :

(لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ)

তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে এইসমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবতীর্ণ করেছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ। (ইসরা- ১০২)

যদিও ফেরাউন বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং সে মানুষকে বলত :

(مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي)

আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ আছে বলে জানিনা।(কাসাস- ৩৮)

কেবলমাত্র যখন গভীর জলে নিমজ্জিত হচ্ছিল তখন বলেছিল :

(آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ)

আমি বিশ্বাস করলাম যে বনী ইসরাঈল যাতে বিশ্বাস করে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। (ইউনুস- ৯০)

আমরা জানি যে, এ ধরনের জরুরী অবস্থার ঈমান গ্রহণযোগ্য নয় যদিও একে ঈমান নামকরণ করা যেতে পারে।

অতএব ঈমানের ভিত্তি বা আস্থা হল আন্তরিকতা ও স্বেচ্ছাপ্রবণতা, যা জ্ঞান ও অবগতির ব্যতিক্রম, যা অনিচ্ছাকৃতভাবেও অর্জিত হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ঈমানকে এক স্বেচ্ছাধীন আন্তরিক কর্ম, বলে গণনা করা যেতে পারে। অর্থাৎ 'কর্মকাণ্ডের ' অর্থকে বিস্তৃত করতঃ ঈমানকেও কর্মকাণ্ডের, অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

অপরদিকে কুফর (كفر) শব্দটি কখনো কখনো বিশ্বাসের অস্থিতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় এবং আস্থা বা বিশ্বাস না থাকার অর্থই হল কুফর, হোক তা দিধা- দ্বন্দ্ব ও নিরেট অজ্ঞতার ফলে কিংবা হোক তা যৌগিক অজ্ঞতার (مركب ئجهل) ফলে অথবা হোক তা নেতিবাচক প্রবণতার ফলে কিংবা হোক তা ইচ্ছাকৃতভাবে ও বৈরীতাবশতঃ অস্বীকারকরণের ফলে। এছাড়া কখনো কখনো শেষোক্ত

প্রকারের কুফর অর্থাৎ হিংসা বিদ্বেষের মত বিদ্যমান বিষয় (امری وجودی) এবং ঈমান বা বিশ্বাসের বিপরীতার্থ বলে পরিগণিত হয়।

ঈমান ও কুফরের পরিমাণ :

পবিত্র আয়াতসমষ্টি থেকে যা আমরা পাই, তার ভিত্তিতে বলা যায় পরকালীন অনন্ত সুখ- সমৃ ির জন্যে ন্যূনতম যতটুকু ঈমান থাকা প্রয়োজন তা হল : মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, পরকালীন পুরস্কার ও শাস্তির প্রতি বিশ্বাস এবং যা কিছু মহান নবীগণের (আ.) উপর নাযিল হয়েছে তাতে বিশ্বাস। আর এ বিশ্বাসসমূহের অপরিহার্য শর্ত হল মহান আল্লাহর আদেশানুসারে কর্ম সম্পাদনের সারসংক্ষিপ্ত সি া ন্ত গ্রহণ, যার সর্বোচ্চ পর্যায় হল, মহান আল্লাহর আম্বিয়া ও আউলিয়ার (সালামুল্লাহ আলাইহীম আজমাইন) জন্যে নির্দিষ্ট।

অপরদিকে ন্যূনতম পর্যায়ের কুফর হল : তাওহীদ নবুয়্যত ও মায়াদকে অস্বীকার করা বা এগুলো সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া অথবা এমন কিছুকে অস্বীকার করা, যার সম্পর্কে জানে যে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর কুফরের নিকৃষ্টতম পর্যায় হল প্রতিহিংসাপরায়ণ বা অবাধ্য হয়ে এ সকল সত্যকে অস্বীকার করা, যদিও এগুলোর সত্যতা সম্পর্কে সে অবগত এবং সত্যদ্বীনের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার সি া ন্ত গ্রহণ।

এভাবে শিরক (বা তাওহীদের অস্বীকৃতি) কুফরেরই একটি দৃষ্টান্ত। আর নেফাক বা কপটতা হল অব্যক্ত কুফর, যা বাহ্যিক ইসলামের আড়ালে প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নয়। আর মুনাফিকদের (অপ্রকাশিত কাফের) পরিণতি অন্যান্য কাফের অপেক্ষা ভয়ংকর হবে। যেমনটি পবিত্র কোরানে বিবৃত হয়েছে :

(إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ)

মুনাফিকরা তো জাহান্নামের নিম্ন স্তরে থাকবে। (নিসা- ১৪৫)

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি যে, ফিকাহশাস্ত্রে যে কুফর ও ইসলামের কথা বর্ণনা করা হয় এবং যা তাহারাত (طهارت), কুরবানীর বৈধতা, বিবাহ ও সম্পদের

উত্তরাধিকারের বৈধতা বা অবৈধতার মত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আহকামের উদ্দেশ্য (موضوع) রূপে পরিগণিত হয়, তার সাথে দ্বীনের মৌলিক বিষয়সমূহের আলোচ্য ঈমান ও কুফরের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ কেউ হয়ত শাহাদাতাইন (আল্লাহ ও তার রাসূলের (সা.) প্রতি সাক্ষ্য প্রদান করে) বলতে পারে এবং ইসলামের হুকুম- আহকাম তার জন্যে প্রযোজ্য হতে পারে, যদিও আন্তরিক ভাবে তাওহীদ ও নবুয়্যত সংক্রান্ত বিষয়গুলোর প্রতি সে কোন আস্থাই স্থাপন করেনি।

অপর বিষয়টি হল, যদি কেউ দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলোকে শনাক্তকরণে অক্ষম, যেমন : উন্মাদ, নির্বোধ অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে সত্য দ্বীনকে চিনতে পারেনি, তবে সে তার অপরাধের পরিমাণে ক্ষমা পাবে। কিন্তু যদি কেউ পারঙ্গমতা সত্বেও অবহেলা করতঃ দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায়ই থাকে, অথবা কোন প্রকার যুক্তি ব্যতীতই দ্বীনের জরুরী বিষয়গুলোকে অস্বীকার করে থাকে, তবে সে ক্ষমা পাবে না এবং অনন্ত শাস্তিতে পতিত হবে।

অনন্ত সুখ ও দুঃখের ক্ষেত্রে ঈমান ও কুফরের প্রভাব :

'মানুষের প্রকৃত উৎকর্ষ বা কামাল, প্রভুর সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে বাস্তবরূপ লাভ করে এবং বিপরীতক্রমে মানুষের অধঃপতন, মহান আল্লাহর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয় - এর আলোকে মহান আল্লাহ ও তার সুনির্ধারিত ও বিধিগত প্রতিপালণত্বের উপর আস্থাপ্রকাশ, যা পুনরুত্থান ও নবুয়্যতের প্রতি বিশ্বাসের জন্যে জরুরী, তাকে মানুষের প্রকৃত উৎকর্ষ সাধনের জন্যে বৃক্ষস্বরূপ মনে করা যেতে পারে, যার পত্র- পল্লব হল মহান আল্লাহর পছন্দনীয় কর্মসমূহ; আর চিরন্তন সুখ- সমৃ হল ফলস্বরূপ, যা পরকালে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করবে। অতএব যদি কেউ ঈমানের বীজ স্বীয় অন্তরাত্মায় বপন না করে কিংবা এ কল্যাণময় বৃক্ষকে রোপণ না করে এবং এর পরিবর্তে কুফর ও পাপাচারের বিষবৃক্ষ স্বীয় অন্তরাত্মায় বপন করে থাকে, তবে সে প্রভু প্রদত্ত যোগ্যতাকে বিনষ্ট করেছে এবং এমন এক বৃক্ষের সেবা সে করেছে, যার ফল হল নারকীয় যাক্কুম। আর এ ধরনের ব্যক্তি অনন্ত সুখ- সমৃ র পথে বিন্দুমাত্রও অগ্রসর হয়নি এবং তার সুকর্মের প্রভাব পৃথিবীর সীমানা অতিক্রম করতে পারবে না।

আর এর গুঢ় রহস্য হল : সকল স্বাধীন নির্বাচনাধীন কর্মই চূড়ান্ত লক্ষ্যের পথে বা ঈপ্সিত লক্ষ্যের পথে, যা কর্তা নিজের জন্যে নির্ধারণ করেছে, তার জন্যে মানুষের গতিস্বরূপ। যদি কেউ অনন্ত জীবন ও আল্লাহর নৈকট্যের প্রতি আস্থা না রাখে, তবে এ ধরনের কোন ব্যক্তি কিরূপে বর্ণিত লক্ষ্যকে নিজের জন্যে স্থির করতে পারবে ? স্বভাবতঃই এরূপ ব্যক্তিরা মহান আল্লাহর নিকট পুরস্কারের আশা করতে পারে না। তবে কাফেরদের সুকর্মের সর্বোচ্চ প্রভাব ধু এতটুকই যে, তাদের শাস্তি কিছুটা হ্রাস করা হবে। কারণ এ ধরনের কর্মের মাধ্যমে আত্মপূজা ও প্রতিহিংসা পরায়ণতার মাত্রা কিছুটা দুবর্ল হয়ে থাকে।

পবিত্র কোরানের বক্তব্য :

পবিত্র কোরান একদিকে মানুষের অনন্ত সৌভাগ্যের পথে ঈমানের মূল ভূমিকার কথা বর্ণনা করে। কয়েকদশক আয়াতে সৎকর্মকে ঈমানের পরপরই উ ৃতকরণ ব্যতীত ও একাধিক আয়াতে অনন্ত সুখ- সমৃ ি র পথে সৎকর্মসমূহের প্রভাবের জন্যে ঈমানকে পূর্ব শর্তরূপে গুরুত্বসহকারে বর্ণনা করেছে । যেমন :

(وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ)

পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেউ সৎকাজ করলে ও মু'মিন হলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে (নিসা- ১২৪) [এ ছাড়া নাহল- ৯৭, ইসরা- ১৯, তোহা- ১১২, আম্বিয়া- ৯৪, গাফির- ৪০ দ্রষ্টব্য]

অপরদিকে দোযখ ও অনন্তশাস্তিকে কাফেরদের জন্যে নির্ধারণ করেছে এবং তাদের কর্মকাণ্ডকে অহেতুক, অনর্থক ও নিষ্ফল বলে গণনা করেছে। অন্য এক স্থানে তাদেরকে এমন ছাই- ভস্মের সাথে তুলনা করা হয়েছে যে, তীব্র বাতাস ঐগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং কোথাও এগুলোর উপস্থিতি খুজে পাওয়া যায় না । কোরানের ভাষায় :

(مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ)

যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে, তাদের উপমা হল, তাদের কর্মসমূহ ভস্ম সদৃশ যা ঝড়ের দিনে প্রচণ্ড বাতাসের বেগে উড়ে চলে যায়। যা তারা উপার্জন করে তার কিছুই তাদের কাজে লাগাতে পারে না। এটা তো ঘোর বিভ্রান্তি। (ইব্রাহীম- ১৮)

অপর এক স্থানে বলা হয় : কাফেরদের কর্মকাণ্ডকে ঘূর্ণবাতের মত ছড়িয়ে দিব।

(وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا)

আমি তাদের কৃতকর্মগুলি বিবেচনা করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণায় পরিণত করব। (ফুরকান- ২৩)

অপর এক আয়াতে কাফেরদের কর্মকাণ্ডকে সেই মরীচিকার সাথে তুলনা করা হয়েছে যে, তৃ ার্ত ব্যক্তি তার দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু সেখানে যখন পৌঁছে কোন পানিরই অস্তিত্ব খুজে পায় না।

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ)

যারা কুফরী করে তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে, কিন্তু সে তার নিকট উপস্থিত হলে দেখবে তা কিছু নয় এবং সে পাবে সেথায় আল্লাহকে, অতঃপর তিনি তার কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দিবেন। আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর। (নূর- ৩৯)

এর পরপরই বলা হয় :

(أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ)

অথবা গভীর সমুদ্রতলের অন্ধকার সদৃশ, যাকে আচ্ছন্ন করে তরংগের উপর তরংগ, যার উর্ধ্বে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ স্তরের উপর স্তর, এমনকি সে হাত বের করলে, তা আদৌ দেখতে পাবে না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেন না, তার জন্যে কোন জ্যোতিই নেই। (নূর- ৪০) [রূপকার্থে বলা হয়েছে যে, কাফেরদের চলাফেরা হল অন্ধকারে এবং কোথাও পৌঁছতে পারে না] অপর এক আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, দুনিয়াপূজারীদের প্রচেষ্টার ফল এ পৃথিবীতেই প্রদান করা হবে এবং পরকালে তারা সকল কিছু থেকে বঞ্চিত হবে। যেমনঃ নিম্নোল্লিখিত আয়াতে বলা হয় :

(مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ)

যদি কেউ পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে তবে দুনিয়াতে আমি তাদের কর্মের পূর্ণ ফল দান করি এবং সেথায় তাদেরকে কম দেওয়া হবে না। (সূরা হুদ - ১৫)

তাদের জন্যে পরলোকে অগ্নি ব্যতীত অন্য কিছুই নেই এবং তারা যা করে পরলোকে তা নিষ্ফল হবে এবং তারা যা করে থাকে তা নিরর্থক। (সূরা হুদ- ১৬) ১৭৮

১৫তম পাঠ

ঈমান ও আমলের পারস্পরিক সম্পর্ক

ভূমিকা :

ইতিমধ্যেই আমরা জেনেছি যে, অনন্ত সুখ- সমৃ ও দুঃখ- দুর্দশার পথে প্রকৃত নির্বাহী হল ঈমান ও কুফর। স্থায়ী ঈমান চিরন্তন সমৃ র দৃঢ় নিশ্চয়তা প্রদান করে যদিও পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার ফলে সীমাব শাস্তি ভোগ করতে হবে। অপরদিকে স্থায়ী কুফর, চিরন্তন দুঃখ- দুর্দশার কারণ হয় এবং এর উপস্থিতিতে কোন প্রকার সুকর্মই পরকালীন সুখ- সমৃ র কারণ হবে না।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করেছিলাম যে, ঈমান ও কুফরের মাত্রা তীব্র ও ক্ষীণ হতে পারে এবং বড় রকমের পাপাচারের বাহুল্য, ঈমান হরণের কারণও হতে পারে। অনুরূপ সুকর্ম সম্পাদন কুফরের শিকড়কে দুর্বল করে ফেলে এবং এমনকি ঈমানের ক্ষেত্রও সৃষ্টি করতে পারে।

এখানেই ঈমান ও আমলের সম্পর্ক বিষয়ে প্রশ্নের গুরুত্ব সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং আলোচ্য পাঠে আমরা এ প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর প্রদান করতে প্রয়াসী হব ।

আমলের সাথে ঈমানের সম্পর্ক :

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে স্পষ্টতঃই প্রকাশ পায় যে, ঈমান হল আত্মার এক বিশেষ অবস্থা, যা জ্ঞান ও প্রবৃত্তি থেকে উৎসারিত হয়। আর এর অপরিহার্য বিষয় হল এই যে, ঈমানদার ব্যক্তি এমন কর্ম সম্পাদনের জন্যে সামগ্রিক সি ান্ত গ্রহণ করে, যা যে বিষয়ে সে আস্থা জ্ঞাপন করেছে তার অনুগামী। অতএব যদি কেউ কোন সত্য সম্পর্কে অবগত থাকে অথচ এ সি ান্ত গ্রহণ করে যে, কখনোই এর অপরিহার্য বিষয়গুলোর কোনটিই সে সম্পাদন করবে না, তবে সে এর উপর আস্থা প্রকাশ করবে না। এমনকি 'আমল করবে কি করবে না ' যদি কেউ এ রকম দ্বিধা- দ্বন্দ্বে

থাকে, তবে সে- ও তখন পর্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করেনি বলে পরিগণিত হবে। পবিত্র কোরান এ প্রসঙ্গে বলে :

(قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ)

আরব মরুবাসীরা বলে, আমরা ঈমান আনলাম, বল তোমরা ঈমান আননি বরং তোমরা বল, 'আমরা আত্মসমর্পণ করেছি; কারণ ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। (হুজুরাত-১৪)

তবে প্রকৃত ঈমানেরও বিভিন্ন পর্যায় বিদ্যমান। দায়িত্ব ও কর্তব্যের জন্যে সংশ্লিষ্ট স্তর বা পর্যায়ের অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে। কাম ও ক্রোধের বশঃবর্তী উত্তেজনা, দুর্বল ঈমানের লোকদেরকে গুনাহে লিপ্ত করতে পারে কিন্তু তা এমন নয় যে, সার্বক্ষণিক পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার অথবা তার বিশ্বাসের সকল অপরিহার্য বিষয়গুলোর বিরু াচরনের সি ান্ত নিবে। তবে ঈমান যত শক্তিশালী ও পূর্ণতর হবে তা যথোপযুক্ত কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে ততবেশী প্রভাব ফেলবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, ঈমান অত্যাবশ্যকীয়ভাবেই এর অনুগামী সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের উপর আমলের দাবীদার। আর এই দাবীর প্রভাবের পরিমাণ, এর তীব্রতা ও ক্ষীণতার সমানুপাতি। সর্বোপরি কোন ব্যক্তির প্রত্যয় ও সি ান্তই কোন কর্ম সম্পাদন কিংবা বর্জন করার ব্যাপারটি নির্ধারণ করে।

ঈমানের সাথে আমলের সম্পর্ক :

ইচ্ছাধীন কর্মকাণ্ড হয় যথাযথ ও বিশাস্বাধীন অথবা অযথা ও বিশ্বাস বিরোধী হয়ে থাকে। প্রথমক্ষেত্রে বিশ্বাস দৃঢ় ও হৃদয় জ্যোতির্ময় হয়ে থাকে। আর দ্বিতীয়ক্ষেত্রে বিশ্বাস দুবর্ল ও হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। অতএব মু'মিনব্যক্তি যে সুকর্ম সম্পাদন করে, যদিও তার ঈমানই এর উৎস, তথাপি বিপরীতক্রমে তার ঈমানকে দৃঢ় ও শক্তিশালী (র্মঐ সৎক) করে। ঈমানের পূর্ণতার ক্ষেত্রে সৎকর্মের প্রভাব সম্পর্কে আমরা নিম্নোল্লিখিত আয়াত থেকে জানতে পারি :

(إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ)

তারই দিকে পবিত্র বাণীসমুহ আরোহণ করে এবং সৎকর্ম তাকে উন্নীত করে। (১০ -ফাতির)
অপরদিকে যখন বিশ্বাস বা ঈমানের পরিপন্থী একাধিক প্রবণতার সৃষ্টি হয় ও অনর্থক কর্ম সম্পাদনের কারণ হয় এবং ব্যক্তির ঈমানের শক্তি যদি এমন পরিমাণে না থাকে যে, ঐ সকল কর্মের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম, তবে তার ঈমান দুর্বল ও অধঃমুখী হয়। ফলে পাপাচারের পুনরাবৃত্তি ঘটার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। আর যদি এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে তবে তা তাকে বড় ধরনের পাপাচারে লিপ্ত করে এবং এর পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। অবশেষে মূল বিশ্বাসই হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে এবং তা কুফর ও কপটতায় পরিবর্তিত হয় (মহান আল্লাহ আমাদেরকে আশ্রয় প্রদান করুন) ।

যাদের কর্মকাণ্ড কপটতায় পরিণত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে পবিত্র কোরান বলে :

(فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ)

পরিণামে তাদের অন্তরে কপটতা স্থিত করলেন আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাত - দিবস পর্যন্ত, কারণ তারা আল্লাহর নিকট যে অংগীকার করেছিল তা ভংগ করেছিল এবং তারা ছিল মিথ্যাচারী। (তাওবাহ- ৭৭)

(ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ)

অতঃপর যারা মন্দকর্ম করেছিল তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ; কারণ তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করত এবং তা নিয়ে ঠাট্টা- বিদ্রুপ করত। (রূম- ১০)

উপসংহার :

ঈমান ও আমলের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং মানুষের সুখ- সমৃ ি র ক্ষেত্রে এতদুভয়ের ভূমিকার আলোকে সৌভাগ্যশালী জীবনকে এমন এক বৃক্ষের সাথে তুলনা করা যায়, যার মূলগুলো এক

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, তার প্রেরিত পুরুষগণ ও বাণীসমূহের প্রতি বিশ্বাস, প্রভুর নিকট থেকে পুরস্কার ও শাস্তি গ্রহণের দিবসের প্রতি বিশ্বাস থেকে রূপ পরিগ্রহ করে। আর এর (বৃক্ষের) কাণ্ড হল ঈমানের অপরিহার্য বিষয়গুলোর উপর আমল করার সামগ্রিক ও সরল সি ান্ত, যা কোন মাধ্যম ব্যতীতই তা (ঈমান নামক শিকড়) থেকে উদগত হয়। এর (বৃক্ষের) পত্র- পল্লাবগুলো ঈমান নামক শিকড় থেকে উৎসারিত হয়। আর এর ফল হল অনন্ত সুখ- সমৃ । ফলে যদি শিকড়ই না থাকে তবে কাণ্ডে কোন শাখা ও পত্রই জন্মাবে না। সুতরাং কোন ফলও ধারণ করবে না।

কিন্তু এমনটিও নয় যে, মূলের অস্তিত্বের সাথে সাথে অপরিহার্যভাবে যথাযথ শাখা- প্রশাখা ও পত্র- পল্লব থাকবে এবং ফল প্রদান করবে। বরং কখনো কখনো পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রতিকূলতার জন্যে কিংবা বিভিন্ন প্রকার রোগ ব্যাধির প্রভাবে প্রয়োজনীয় পত্র- পল্লব জন্মাতে পারে না। এমনকি এর ফলে কেবলমাত্র ফল ধারণ করেনা যে তা- ও নয়; বরং কখনো কখনো বৃক্ষের কিয়ে যাওয়ারও কারণ হয়।

অনুরূপ কাণ্ড, শাখা, এমনকি মূলের কলমের ফলে অপর এক ধরনের বৈশিষ্ট্যও তা থেকে প্রকাশ লাভ করতে পারে এবং কখনো কখনো তা পরিবর্তিত হয়ে অপর এক ধরনের বৃক্ষেও রূপ নিতে পারে। আর এটাই হল সেই ঈমানের কুফরে (মুর্তাদ) পরিবর্তিত হওয়া ।

সিদ্ধান্ত :

ঈমান হল মানুষের সুখ- সমৃ র পথে মূল নির্বাহী। কিন্তু এ নির্বাহীর পরিপূর্ণ প্রভাব, কল্যাণময় কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ এবং পাপাচার থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে ক্ষতিকর দ্রব্য বর্জন ও মরক নিধনের শর্তাধীন। ওয়াজেবসমূহ পরিত্যাগ ও হারামকর্মে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কখনো কখনো ক্ষ বৃক্ষের রূপ ধারণ করে। যেমন : ভ্রান্ত বিশ্বাসের বন্ধনের ফলে ঈমানের সত্ত্বা ও স্বকীয়তা পাল্টে যায় ।

১৬তম পাঠ

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

ভূমিকা :

ইসলামী সংস্কৃতির সাথে যাদের যথেষ্ট পরিচয় নেই এবং যারা মানবীয় প্রবৃত্তিকে বাহ্যিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করে থাকেন; এ ছাড়া কর্তার প্রবণতা ও নিয়্যাতের গুরুতের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই করেন না, অর্থাৎ পারিভাষিক অর্থে যাকে বলা হয় হুসনে ফায়েলী (হুসনে ফে ’ লীর বিপরীতে) নেই, অথবা কেবলমাত্র অপরের পার্থিব জীবনের সুখ- সমৃ তে আপন কর্মের প্রভাবকেই কর্মের মানদণ্ড বলে মনে করেন, তবে এ ধরনের ব্যাক্তিরা ইসলামের অনেক বিশ্বাস ও পরিচিতির ব্যাখ্যায় ভ্রান্তপন্থা অবলম্বনে বাধ্য হয় অথবা ঐগুলোকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়। যেমন : ঈমানের ভূমিকা ও সৎকর্মের সাথে ঈমানের সম্পর্ক, কুফর ও শিরকের ধ্বংসাত্মক ভূমিকা ইত্যাদি ব্যাখ্যা কোন কোন গরিষ্ঠ পরিমাণের ও বিস্তৃত সময়ের কর্মকাণ্ডের উপর লঘিষ্ঠ পরিমাণের ও ক্ষুদ্র সময়ের কর্মকাণ্ডের অগ্রাধিকারের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তারা বক্রচিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করে। অর্থাৎ তারা এরূপ মনে করেন যে, মহান আবিষ্কারকগণ যে অপরের সুখ- সমৃ র উপকরণের যোগান দিয়েছেন অথবা মুক্তিকামীগণ যে তাদের জাতির মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করেছেন, তারা সঙ্গত কারণেই পরকালে উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হবেন - যদিও আল্লাহ ও পুনরুত্থান দিবসের প্রতি তাদের কোন বিশ্বাস না থেকে থাকে। কখনো কখনো এমন পর্যায়ে পৌঁছেন যে, প্রকৃত সুখ- সমৃ র জন্যে জরুরী ঈমানকে, এ পৃথিবীরই শ্রমিক ও কর্মজীবী মানুষের মানবিক মূল্যবোধ ও তাদের বিজয়ের প্রতি ‘বিশ্বাস স্থাপন করার ’ কথা উল্লেখ করে থাকে । এমনকি ‘খোদাকেও ’ তারা মূল্যবোধ ও চারিত্রিক আদর্শের তাৎপর্যের আওতায় ব্যাখ্যা করে থাকেন ।

যদিও পূর্ববর্তী পাঠসমূহের আলোচিত বিষয়ব থেকে এ রকমের ধারণার দুর্বলতা ও আসরতা সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব, তথাপি আজকের যুগে এ রকমের ধারণার বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে তা যে, বিপর্যয় বয়ে আনতে পারে, তা বিবেচনা করলে, ঐগুলো সম্পর্কে অধিকতর ব্যাখ্যা -বিশ্লেষণ করাটা সময়োচিত বলে মনে করি।

তবে এ সকল বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত ও সর্বাত্মক আলোচনার জন্যে যথেষ্ট সময় ও সুযোগের প্রয়োজন। ফলে আমরা এখানে ঐগুলোর বিশ্বাসগত দিকের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং এ পুস্তকের বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করে, কেবলমাত্র মূল বিষয়সমূহের উল্লেখেই সচেষ্ট হব।

মানুষের প্রকৃত উৎকর্ষ বা কামাল :

যদি আমরা একটি ফলবতী আপেল বৃক্ষকে একটি ফলবিহীন আপেল বৃক্ষের সাথে তুলনা করি, তবে ফলবতী বৃক্ষটিকে ফলবিহীন বৃক্ষটির চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী মূল্যবান বলে গণনা করব। আর এটা কেবলমাত্র এ কারণেই নয় যে, মানুষ ফলবতী বৃক্ষ থেকে অধিকতর লাভবান হয় বরং এটা এ কারণে যে, ফলবতী বৃক্ষ অস্তিত্বের দিক থেকে পূর্ণতর এবং এর অস্তিত্বগত প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশী, ফলে সত্তাগতভাবেই মূল্যবান। কিন্তু এ আপেল বৃক্ষই যখন রোগাক্রান্ত ও পূর্ণতার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে তখন তা স্বীয় মূল্য হারায় এবং এমনকি অপরকে কলুষিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করার উৎসেও পরিণত হতে পারে।

মানুষও অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় এরূপ। যদি সে তার উপযুক্ত উৎকর্ষে পৌঁছতে পারে এবং তার ফিত্রাত সংশ্লিষ্ট অস্তিত্বগত প্রভাব প্রকাশ লাভ করে থাকে, তবে সে অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে অধিকতর মর্যাদা ও মূল্যমানের অধিকারী হবে। কিন্তু যদি সে ব্যাধিগ্রস্ত ও বিচ্যুত হয় তবে অন্যান্য প্রাণীর চেয়েও নিকৃষ্টতর ও ক্ষতিকারক হতে পারে। যেমন : পবিত্র কোরানে কোন কোন মানুষকে সকল প্রাণীর চেয়ে নিকৃষ্ট ও চতুষ্পদ প্রাণীর চেয়েও মূঢ় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ)

আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জীব সে বধির ও মূক, যারা কিছুই বুঝে না। (আনফাল- ২২)

(أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ)

এরা প র ন্যায় বরং তা অপেক্ষাও অধিক মূঢ়। (আ'রাফ- ১৭৯)

অপরদিকে যাদি কেউ আপেল বৃক্ষকে কেবলমাত্র অংকুরিত অবস্থায়ই দেখে থাকেন, তবে তার ধারণা এই যে, এর বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায় হল অংকুরিত হওয়াই এবং ততোধিক পূর্ণতা আর নেই। অনুরূপ যদি কেউ কেবলমাত্র মানুষের মধ্যম ধরনের পূর্ণতার সাথে পরিচিত হয়ে থাকেন তবে তিনি প্রকৃত কামাল বা পূর্ণতার সঠিক ধারণা লাভে ব্যর্থ হবেন । কেবলমাত্র তারাই মানুষের সঠিক মূল্যায়নে সক্ষম হবেন, যারা তার চূড়ান্ত উৎকর্ষ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকবেন।

তবে মানুষের প্রকৃত উৎকর্ষ বা কামাল ব গত ও প্রকৃতিগত উৎকর্ষের মত নয়। কারণ যেমনি আমরা ইতিপূর্বেও উল্লেখ করেছিলাম যে, মানুষের মনুষ্যত্ব রূহে মালাকুতী বা আত্মার উপর নির্ভরশীল এবং ব তঃ প্রকৃত মানবীয় উৎকর্ষ হল এ আত্মারই উৎকর্ষ যা স্বীয় ইচ্ছাধীন কর্মতৎপরতার মাধ্যমে অর্জিত হয় হোক তা অন্তর্গত বা আত্মিক তৎপরতা কিংবা হোক বাহ্যিক ও শরীরবৃত্তিক তৎপরতা। আর এ ধরনের কামাল বা পূর্ণতাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা ও সংখ্যাগত মানদণ্ডের ভিত্তিতে শনাক্ত করা যায় না বা অনুমান করা যায় না। ফলে স্বভাবতঃই এ উৎকর্ষ সাধনের পথও পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত উপকরণের মাধ্যমে অনুধাবনযোগ্য নয়। অতএব যিনি স্বংয় এ ধরনের উৎকর্ষ লাভ করতে পারেননি এবং একে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞানের মাধ্যমে অনুধাবন করতে পারেননি, তাকে বু বৃত্তিক যুক্তির মাধ্যমে অথবা ওহী ও ঐশী গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে।'

ওহীর মতে এবং কোরান ও পবিত্র আহলে বাইত ও মাসুমগণের (আ.) বর্ণনা মতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, মানুষের চূড়ান্ত কামাল বা উৎকর্ষ হল তারই অস্তিত্বের একটি পর্যায় যা "প্রভুর নৈকট্য" রূপে বর্ণিত হয়েছে। আর এ উৎকর্ষের প্রভাব হল অনন্ত বৈভবসমূহ ও প্রভুর

সন্তুষ্টি, যা পরকালে আত্মপ্রকাশ করবে। ব তঃ এ উৎকর্ষের সামগ্রীক পথ হল প্রভুর ইবাদত বা উপাসনা ও তাকওয়া, যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সকল স্তরকে সমন্বিত করে।

তবে বু বৃত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে, অনেক জটিল যুক্তি- প্রমাণও এ বিষয়ের উপর বর্ণনা করা যেতে পারে, যার জন্যে একাধিক দার্শনিক প্রারম্ভিকার প্রয়োজন হয়। ফলে আমরা এখানে সহজ- সরলভাবে বিষয়টি উপস্থাপনের চেষ্টা করব।

বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যা :

মানুষ ফিতরাতগতভাবেই অসীম কামাল বা পূর্ণতা কামনা করে। জ্ঞান ও সামর্থ্য এর বহিঃপ্রকাশ বলে পরিগণিত হয়। আর এ ধরনের পূর্ণতা লাভই অসীম ভোগ- বিলাস ও চিরস্থায়ী সুখ- সমৃ র কারণ। মানুষের জন্যে এ পূর্ণতা বা কামাল তখনই সম্ভব হবে যখন অসীম জ্ঞান, ক্ষমতা ও পরমপূর্ণতার আধারের সাথে অর্থাৎ মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হবে। আর এ সম্পর্কই আল্লাহর সান্নিধ্য (قرب) নামে পরিচিত।[১৭৯] অতএব মানুষের প্রকৃত উৎকর্ষ বা পূর্ণতা, যা হল তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য, তা মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে ও তারই নৈকট্যের ছায়ায় অর্জিত হয়। আর যে ব্যক্তি এই কামাল বা উৎকর্ষের সর্বনিম্নস্তরে পৌঁছতে ব্যর্থ হয় অর্থাৎ দুর্বলতম পর্যায়ের ঈমানও যার না থাকে তবে সে সেই বৃক্ষের মতই, যে বৃক্ষ এখনও ফলবতী হয়নি ও ফল প্রদান করেনি। আর যদি এ ধরনের বৃক্ষ মড়কের ফলে ফলপ্রদানের ক্ষমতা ও সার্মথ্য হারায়, তবে তা হবে নিষ্ফল বৃক্ষসমূহ থেকেও নিকৃষ্ট।

অতএব মানুষের কামাল বা পূর্ণতা ও সুখ- সমৃ অর্জনের পথে ঈমানের ভূমিকা এ দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্ববহ যে, মানুষের আত্মা বা রূহের মূলবিশেষত্বই হল মহান আল্লাহর সাথে সচেতন ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সম্পর্ক থাকা। আর এ সম্পর্ক ব্যতীত যথোপযুক্ত উৎকর্ষ ও তার প্রভাব থেকে বঞ্চিত হবে। অন্যভাবে বলা যায় : কার্যক্ষেত্রে তার মনুষ্যত্ব লাভ হয় না। আর যদি স্বাধীনতার অপব্যবহারের ফলে এ রকম সমুনত যোগ্যতাকে বিনষ্ট করে তবে সে ভয়ংকরতম অত্যাচারের

বোঝা স্বীয় স্কন্ধে ধারণ করল, যার ফলে সে অনন্ত শাস্তিতে পতিত হতে বাধ্য হবে। পবিত্র কোরান এ ধরনের ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলে :

(إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ)

আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট জীব তারাই যারা কুফরী করে এবং ঈমান আনে না।(আনফাল - ৫৫)
উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, পূর্ণতা ও সুখ- সমৃ ি র অথবা অধঃপতন ও দুঃখ- দুর্দশার পথে ধাবিত হওয়ার দিক নির্ধারণ করে, যথাক্রমে ঈমান অথবা কুফর। স্বভাবতঃই (ঈমান ও কুফরের মধ্যে) যে কোনটি সর্বশেষে অবস্থান নেয়, তাই চূড়ান্ত ও ভাগ্য নির্ধারণী ভূমিকা রাখবে।

উদ্দীপক ও নিয়্যাতের ভূমিকা:

উপরোল্লিখিত নীতির আলোকে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের ইচ্ছাধীন কর্মকাণ্ডের প্রকৃত মূল্য নির্ভর করে সত্যিকারের পূর্ণতা বা কামাল অর্জনের পথে অর্থাৎ মহান আল্লাহর নৈকট্যের পথে, ঐ গুলোর প্রভাব বা ভূমিকার উপর। যদিও ব্যক্তির কর্মকাণ্ডসমূহ প্রকারান্তরে (এমনকি একাধিক মাধ্যমান্তে) অপরের পূর্ণতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে থাকে, তবে সেগুলো সুন্দর ও প্রকৃষ্টরূপে গুণান্বিত হলেও কর্তার অনন্ত সুখ- সমৃ ি র ক্ষেত্রে ঐ কর্মগুলোর ভূমিকা নির্ভর করে, তার আত্মার উৎকর্ষ সাধনের পথে তার কর্মকাণ্ডের প্রভাবের উপর ।

অপরদিকে বাস্তব কর্মকাণ্ডের সাথে কর্তার আত্মা বা রূহের সম্পর্ক, ইচ্ছা বা ইরাদার মাধ্যমে অর্জিত হয়, যা হল তার প্রত্যক্ষকর্ম। আর কর্ম সম্পাদনের ইচ্ছা, কর্মফলের প্রতি তার ঝোঁক, প্রবণতা ও আকর্ষণ থেকে জন্ম নেয় । এ প্রবণতা বা ঝোঁকই উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে তার আত্মায় গতিসঞ্চার করে এবং কর্ম সম্পাদনের ইচ্ছারূপে প্রজ্জোলিত হয়। অতএব ইচ্ছাধীন কর্মসমূহের মূল্য কর্তার ঝোঁক ও নিয়্যাতের অনুগামী এবং কর্মের সততা (حسن فعلى) কর্তার সততা (حسن فاعلى) ব্যতীত আত্মার উৎকর্ষ ও অনন্ত সুখ- সমৃ ি র ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে না। আর

এ জন্যেই, যা ব গত ও পার্থিব উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়, অনন্ত সুখ- সমৃ ি র পথে তা কোন ভূমিকা রাখবে না এবং সামাজিক কল্যাণে বৃহত্তম কর্মতৎপরতাও যদি আত্মম্ভরিতাহেতু চালানো হয়, তবে পরকালে কর্তার জন্যে তা ন্যূনতম লাভও বয়ে আনবে না ।[১৮০] বরং তার জন্যে ক্ষতিকর ও চারিত্রিক অবক্ষয়ের কারণ হতে পারে। এ কারণেই পবিত্র কোরান পরকালীন সুখ- সমৃ ি র পথে সৎকর্মের প্রভাবকে ঈমান ও স্রষ্টার নৈকট্যলাভের আশা করার শর্তাধীন বলে উল্লেখ করেছে ।[১৮১]

و اراد وجه الله و ابتغاء مرضات الله

অর্থাৎ 'আল্লাহর জন্যে ইরাদা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে প্রচেষ্টা। '

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সি ান্তে পৌঁছতে পারি যে, প্রথমতঃ সৎকর্ম, অপরের কল্যাণ সাধনের মধ্যেই সীমাব   নয়। দ্বিতীয়তঃ অপরের কল্যাণ সাধনও ব্যক্তিগত ইবাদতের মত তখনই চূড়ান্ত উৎকর্ষ ও অনন্ত সুখ- সমৃ ি র ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে যখন ঐশী উদ্দেশ্য থেকে উৎসারিত হবে।

১৭তম পাঠ

কর্ম নি   ল হওয়া ও পাপমোচন

ভূমিকা :

“পরকালীন সুখ- সমৃ র সাথে ঈমান ও সৎকর্মের সম্পর্ক এবং অপরদিকে অনন্ত দুঃখ- দুর্দশার সাথে কুফর ও গুনাহের সম্পর্ক ” শিরোনামে যে বিষয়টি আলোচিত হয় তা হল : পরকালীন ফলাফলের সাথে ঈমান ও কুফরের প্রতি মুহূর্তের সম্পর্ক, অনুরূপ পুরস্কার ও শাস্তির সাথে সকল সুকর্ম ও দুষ্কর্মের সম্পর্ক কি চূড়ান্ত, অপরিবর্তনীয় ও স্থায়ী, না কি পরিবর্তনশীল? যেমন : পাপাচারের কুফলকে, সুকর্মের মাধ্যমে পুষিয়ে নেয়া যায় কি? কিংবা বিপরীতক্রমে সুকর্মের সুফল পাপাচারের মাধ্যমে বিনষ্ট হতে পারে কি ? যদি কেউ জীবনের কিছু অংশ কুফর, পাপাচারে এবং কিছু অংশ ঈমান ও আনুগত্যের পথে অতিবাহিত করে, তবে কি সে কিছু সময় শাস্তি ভোগ করবে, আবার অপর কিছু সময় পুরস্কারের অধিকারী হবে? কিংবা এ দুয়ের সম্মিলিত চূড়ান্ত ফলাফলের মাধ্যমেই কি অনন্ত জীবনে মানুষের সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য নির্ধারিত হয় ? না কি এর ব্যতিক্রম কোন বিষয় ?

প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়টি হল তা- ই, ‘যা হাবিত ও তাকফির’[১৮২] নামে যুগ যুগ ধরে আশয়ারী ও মো’তাযেলী কালমশাস্ত্রবিদগণের মধ্যে আলাপ- আলোচনার বিষয় বলে পরিগণিত হয়ে আসছে। আমরা এখানে শিয়া মতবাদের দৃষ্টিকোণে এ বিষয়টি সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করব ।

ঈমান ও কুফরের সম্পর্ক :

পূর্ববর্তী পাঠসমূহ থেকে আমরা ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছি যে, কোন সুকর্মই মৌলিক বিশ্বাসসমূহের উপর আস্থা স্থাপন ব্যতীত, অনন্তঃ সুখ- সমৃ র কারণ হতে পারে না। অন্য কথায় :

কুফর, পুণ্যকর্মসমূহের নিষ্ফলতার কারণ। এখানে উল্লেখ করব যে, জীবনের শেষার্ধে যদি কেউ ঈমান আনে, তবে তা পূর্বকত কুফরীর সকল কুপভাব মোচন করে এবং উজ্জল- দীপ্তিময় শিখার মত পূর্বের্র সকল অমানিশাকে বিদূরিত করে। বিপরীতভাবে সর্বশেষে কৃত কুফর, পূর্বকৃত ঈমানের সকল সুফলকে বিনষ্ট করে এবং ব্যক্তির জীবনের সকল পাতাগুলোকে কালো ও দুর্ভাগ্যের তিমিরে পরিণত করে, আর খড়ের স্তপে পতিত অগ্নিস্তফুলিংগের মত সর্বস্ব ভস্মিভূত করে। উদাহরণস্বরূপ : ঈমান উজ্জল দীপের মত অন্তরাত্মার ঘরকে উজ্জল- দীপ্তিময় করে তুলে এবং অন্ধকার ও তিমিরকে হৃদয় গহ্বর থেকে দূরীভূত করে। অপরদিকে কুফর সে নির্বাপিত দীপের মতই যা আলোর অবসান ঘটিয়ে অন্ধকারের সূচনা করে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানবাত্মা এ পরিবর্তনশীল ও ব গত বিশ্ব ও অস্থিতিশীল অবস্থার সাথে সম্পর্কিত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সর্বদা অন্ধকার ও আলোর তীব্রতা ও ক্ষীণতার সীমায় অবস্থান করবে। আর এ অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে এ ক্ষণস্থায়ী আবাসস্থল ছেড়ে পরপারে যাওয়ার জন্যে প্র ত হবে এবং ঈমান ও কুফরের পথ তার জন্যে বন্ধ হবে। তখন সে যতই পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে এসে অন্ধকার থেকে মুক্ত হওয়ার ইচ্ছা করুক না কেন, তা তার কোন উপকারে আসবে না । [পাঠ- ৪৯ দ্রষ্টব্য] পবিত্র কোরানের মতে ঈমান ও কুফরের এ পারস্পরিক প্রভাব সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই এবং পবিত্র কোরানের অসংখ্য আয়াত এ বিষয়ের স্বপক্ষেই সাক্ষি প্রদান করে। যেমন :

(وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ)

যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, তিনি তার পাপ মোচন করবেন। (তাগাবুন- ৯)

অপর এক আয়াতে বলা হয় :

(وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)

তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্বীয় দ্বীন হতে ফিরে যায় এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারী রূপে মৃত্যু মুখে পতিত হয়, ইহকাল ও পরকালে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। (বাকারা- ২১৭)

সুকর্ম ও দু র্মের সম্পর্ক :

ঈমান ও কুফরের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের মত সুকর্ম ও দুষ্কর্মের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের উদাহরণও বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু তা সামগ্রিকভাবে নয় এবং এ রূপে নয় যে, হয় মানুষের আমলনামায় সর্বদা সৎকর্মসমূহ লিপিব হয় ও পূর্ববর্তী অপকর্মসমূহ মুছে যায় অথবা সকর্ল অপকর্মসমূহ লিপিব হয় ও পূর্ববর্তী সকল সৎকর্ম মুছে যায় (যেমনটি কোন কোন মো'তাযেলী কালামশাস্ত্রবিদগণ মনে করেছেন)। কিংবা এ রকমটিও নয় যে, সর্বদা পূর্ববর্তী কর্মসমূহের গুণ ও মানের আলোকে মোট চূড়ান্ত ফল তার আমলনামায় লিপিব হয় (যেমনটি অপর কেউ কেউ মনে করেছেন)। বরং মানুষের আমলের বিষয়টিকে আরও সূক্ষ্ণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করতে হবে। অর্থাৎ কোন কোন সৎকর্ম (যদি সঠিক ও কাঙ্খিত রূপে সম্পন্ন করা হয়) পূর্ববর্তী সকল অপকর্মের ফলাফলকে দূরীভূত করে। যেমন : তওবাহ যদি কাঙ্খিতরূপে সম্পাদন করা হয়, তবে ব্যক্তির পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[১৮৩] ঠিক আলোকচ্ছটার মত সরাসরি অন্ধকার বিন্দুতে আলোকবিম্ব ফেলে ও আলোকিত করে। কিন্তু সকল সৎকর্মই সকল প্রকার পাপাচারের কুফলকেই দূরীভূত করে না। ফলে এ দৃষ্টিকোণ থেকে মু'মিন ব্যক্তি পরকালে একটি বিশেষ সময় ধরে শাস্তি ভোগ করার পর, পরিশেষ চিরন্তন বেহেস্তে প্রবেশ করতে পারে। যেন মানবাত্মার একাধিক দিক বিদ্যমান এবং প্রত্যেক শ্রেণীর কর্মকাণ্ড, সুকর্ম ও কুকর্ম এর বিশেষ নীতি- কৌশলের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন : 'ক ' নীতি- কৌশলের সাথে সংশ্লিষ্ট সৎকর্ম, 'খ ' নীতি- কৌশলের সাথে সংশ্লিষ্ট পাপাচারের কুফলকে বিনষ্ট করে না, যদি না সৎকর্ম এতটা জ্যেতির্ময় হয় যে, আত্মার অপরাপর অংশেও বিচ্ছুরিত হয় কিংবা পাপ এতটা 'কলুষতা ' সৃষ্টিকারী হয় যে, অপরাপর অংশকে ও কলুষিত করে। উদাহরণতঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে

যে, গ্রহণযোগ্য নামায, পাপাসমূহকে ধৌত করে এবং পাপ ক্ষমার কারণ হয়। পবিত্র কোরানে বলা হয় :

(وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ)

সালাত কায়েম করিবে দিবসের দুই প্রান্ত ভাগে ও রজনীর প্রথমাংশে । সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্ম মিটাইয়া দেয়।(হুদ- ১১৪)

পিতা- মাতার অবাধ্যতা ও মদপানের মত কিছু কিছু পাপকর্ম নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ইবাদত কবুলের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে কিংবা কারও প্রতি অনুগ্রহ করার পর তাকে ছোট করার ফল্রে ঐ কর্মের সুফল বিনষ্ট হয়ে যায়। যেমনটি পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে :

(لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى)

দানের কথা প্রচার করে এবং ক্লেশ দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে নিষ্ফল করনা। (বাকারা- ২৬৪)

কিন্তু সৎকর্ম ও দুষ্কর্মের পারস্পরিক প্রভাবের প্রকৃতি ও পরিমাণ সম্পর্কে ওহী ও মাসূমগণের (আ.) মাধ্যমে অবগত হতে হবে এবং এগুলোর প্রত্যেকটি সম্পর্কে কোন সাধারণ নিয়ম নির্ধারণ করা যায় না ।

সর্বশেষে এতটুকু বলার অবকাশ থাকে যে, সৎকর্ম ও অসৎকর্ম কখনো কখনো এ পার্থিব জগতেই সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের অথবা অপর কোন কর্ম সম্পাদনের সামর্থ্য লাভ ও সামর্থ্য হারানোর কারণ হয় । যেমন : অপরের প্রতি দয়াদ্র হওয়া, বিশেষ করে পিতা- মাতা ও আত্মীয়- স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার, দীর্ঘায়ু লাভের ও রোগ- বালাই দূর হওয়ার কারণ হয়। অপরদিকে বয়ঃজ্যেষ্ঠদের বিশেষ করে ওস্তাদ ও শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন, সামর্থ্য হারানোর কারণ হয়। কিন্তু এর প্রভাবের ফল চূড়ান্ত পুরস্কার ও শাস্তি লাভার্থে নয়। পুরস্কার ও শাস্তি লাভের প্রকৃত স্থান হল অনন্ত ও চিরন্তন জগৎ।

১৮তম পাঠ

বিশ্বাসীদের বিশেষ সুবিধা

ভূমিকা:

খোদাপরিচিতি পর্বে [১৮৪] আমরা জানতে পেরেছি যে, প্রভুর ইরাদা মূলতঃ কল্যাণ ও কামালের সাথেই সম্পর্কিত। আর অকল্যাণ ও অপূর্ণতা (মানুষের ইচ্ছার) অনুগামীক্রমে প্রভুর ইরাদার সাথে সম্পর্কিত হয়। স্বভাবতঃই মানুষের ক্ষেত্রেও প্রভুর মূল ইরাদা মানুষের উৎকর্ষ অনন্তসৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া ও চিরন্তন নেয়ামত ভোগ করার সাথে সম্পর্কিত। আর অনাচারিদের শাস্তি ও দুর্ভাগ্য, যা তাদের অপইচ্ছার ফল, তা অনুগামীক্রমে প্রভুর প্রজ্ঞাময় ইরাদার আওতাভুক্ত হয়। যদি শাস্তি ও দুঃখ দুর্দশা মানুষেরই কুপ্রবণতার অপরিহার্য বিষয় না হত, তবে প্রভুর বিস্তৃত রহমতের দাবী হত এই যে, সৃষ্টির কোন সদস্যই আযাব ও শাস্তিতে পতিত হবে না।[১৮৫] কিন্তু প্রভুর এ অসীম রহমতের ফলেই স্বাধীনতা ও নির্বাচনাধিকার সহকারে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। আর ঈমান ও কুফর এ দু'পথের যে কোন একটি নির্বাচনের অপরিহার্য ফল হল সৌভাগ্যময় বা দুর্ভাগ্যময় পরিণামে উপনীত হওয়া। তবে পার্থক্য ধু এটুকু যে, সৌভাগ্যময় পরিণামে উপনীত হওয়া প্রভুর প্রকৃত ইরাদার সাথে সম্পর্কিত; আর দুর্ভাগ্যময় পরিণাম অনুগামীক্রমে প্রভুর ইরাদার সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং এ পার্থক্যেরই দাবী হল এই যে, সৃষ্টি ও বিধান উভয় ক্ষেত্রেই কল্যাণের দিকটি অগ্রাধিকার পাবে। অর্থাৎ অস্তিত্বগতভাবে মানুষ এমনভাবে সৃষ্টি হবে যে, কল্যাণকর্মসমূহ তার ব্যক্তিত্বে অপেক্ষাকৃত গভীর প্রভাব ফেলে, আর বিধিগতভাবে সহজ ও সরল দায়িত্ব লাভ করে, যাতে সৌভাগ্য ও চিরন্তন শাস্তি থেকে মুক্তির পথে কোন কঠিন দুরূহ দায়িত্ব পালণের প্রয়োজনীয়তা না থাকে।[১৮৬] অপরদিকে পুরস্কার ও শাস্তির ক্ষেত্রে, পুরস্কারের ব্যাপার অগ্রাধিকার পাবে। আর রহমত ও ক্রোধের ক্ষেত্রে রহমত অগ্রাধিকার পাবে।[১৮৭] রহমতের এ

অগ্রাধিকারের স্ফুরণ যে সকল বিষয়ে প্রকাশ পায়, সে গুলোর মধ্যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরব।

পুণ্য বৃদ্ধি :

পরকালীন সৌভাগ্য কামনাকারীদের জন্যে মহান আল্লাহ প্রথম যে প্রাধিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা হল : কেবলমাত্র আমলের সমপরিমাণ পুণ্যই তাকে দেয়া হবে না, বরং বর্ধিত মানের পূণ্য তাকে দেয়া হবে। এ বিষয়টি পবিত্র কোরানে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে। যেমন :

(مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا)

যে কেউ সৎকর্ম নিয়ে আসবে সে উৎকৃষ্টতর প্রতিফল পাবে। (সূরা নামল- ৮৯)

(وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا)

যে উত্তম কাজ করে আমি তার জন্যে তাতে কল্যাণ বর্ধিত করি। (রা- ২৩)

(لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ)

যারা মংগলকর কার্য করে তাদের জন্যে আছে মংগল এবং আরো অধিক। (ইউনুস- ২৬)

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا)

আল্লাহ অণু পরিমাণও জুলুম করেন না এবং অণু পরিমাণ পুণ্য কার্য হলেও আল্লাহ তা দিগুণ করেন, আর আল্লাহ তার নিকট হতে মহা পুরস্কার প্রদান করেন। (নিসা- ৪০)

(مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ)

কেউ কোন সৎ কার্য করলে সে তার দশগুণ পাবে এবং কেউ কোন অসৎকার্য করলে তাকে শুধু তারই প্রতিফল দেয়া হবে। আর তার প্রতি জুলম করা হবে না। (আনআম- ১৬০)

ক্ষুদ্র পাপসমূহের জন্যে ক্ষমা লাভ :

অপর প্রাধিকারটি হল মু'মিনগণ যদি বড় গুনাহসমূহ থেকে দূরে থাকেন, তবে দয়াময় আল্লাহ তাদের ক্ষুদ্র গুনাহসমূহ ক্ষমা করতঃ ঐগুলোর কুফল থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন । যেমন :

(إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا)

তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা গুরুতর তা হতে বিরত থাকলে তোমাদের লঘুতর পাপগুলো মোচন করব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাব। (নিসা- **৩১**) স্পষ্টতঃই এ ধরনের ব্যক্তিবর্গের জন্যে ক্ষুদ্র গুনাহসমূহের ক্ষমাকরণ তওবাহর শর্তাধীন নয় । কারণ তওবাহ্ বড় গুনাহসমূহ থেকেও মুক্তি লাভের কারণ।

অন্যের কর্ম থেকে লাভবান হওয়া :

মুমিনদের অপর একটি সুবিধা হল, কোন ফেরেশতা ও আল্লাহর নির্বাচিত ব্যক্তিরা যদি তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন তবে মহান আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।[১৮৮] অনুরূপ অন্যান্য মু'মিনগণের দোয়া ও ইস্তিগফার তাদের জন্যেও মঞ্জুর করা হয়। এমনকি কোন মু'মিন ব্যক্তির জন্যে যদি কেউ কারও আমল উৎস্বর্গ করে, তবে তার নিকটও (অন্য এক মু'মিন) তা পৌঁছে। আলোচ্য বিষয়গুলো অসংখ্য আয়াত ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু এ বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে শাফায়াতের সাথে জড়িত সেহেতু এ বিষয়টি সম্পর্কে তুলনামূলক ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে। ফলে এখানে আমরা এতটুকু ইঙ্গিত দিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছি।

১৯তম পাঠ

শাফায়াত

ভূমিকা :

মহান আল্লাহ মু'মিনদের জন্যে অপর যে সুযোগ- সুবিধা নির্ধারণ করেছেন, তা হল : যদি মু'মিন ব্যক্তি আমৃত্যু স্বীয় ঈমানকে সংরক্ষণ করে এবং যদি এমন কোন গুনাহে লিপ্ত না হয়, যার ফলে সামর্থ্যহৃত হয়, দুর্ভাগ্যময় পরিণতির স্বীকার হয় ও অবশেষে দ্বিধা- দ্বন্দ্বে পতিত হয় কিংবা সত্যকে অস্বীকার করে, এককথায় যদি বিশ্বাসী অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করে, তবে চিরন্তন শাস্তিতে পতিত হবে না। তার ক্ষুদপাপসমূহ, বড়গুনাহ থেকে দূরে থাকার কারণে ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর বড় পাপসমূহ পূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য তওবাহর মাধ্যমে ক্ষমা করা হবে। যদি এরূপ তওবাহ করতে সক্ষম না হয় তবে, পার্থিব কষ্ট- ক্লেশের মাধ্যমে তার গুনাহের বোঝা লাঘব করা হবে এবং বারযাখে ও পুনরুত্থানের প্রারম্ভেই কষ্ট ভোগের মাধ্যমে তাকে কলুষতা থেকে মুক্ত করা হবে। এর পরও যদি সে তার গুনাহের কলুষতা থেকে মুক্ত না হতে পারে, তবে শাফায়াতের (মহান আল্লাহর অসীম ও বিস্তৃত অনুগ্রহের জ্যোতিকণা, যা নবীগণ (আ.), বিশেষ করে মহানবী (সা.) ও তার মহান আহলে বাইতগর্ণের (আ.) উপর আপতিত হয়েছে) মাধ্যমে নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করবে।[১৮৯] অসংখ্য হাদীসে যে "মাকামে মাহমূদ"[১৯০] বা প্রশংসিত স্থানের উল্লেখ রয়েছে, যার প্রতিশ্রুতি পবিত্র কোরানে মহান নবীকে (সা.) প্রদান করা হয়েছে মূলতঃ তা এ শাফায়াতেরই স্থান। এ ছাড়াও উল্লেখ করা হয়েছে :

(وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى)

অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেন আর তুমি সন্তুষ্ট হবে। (যোহা- ৫)

উপরোক্ত আয়াতটি যারা শাফায়াতলাভের যোগ্য, হযরতের (সা.) শাফায়াতের মাধ্যমে তাদেরকে ক্ষমা করা হবে - এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে।

অতএব মু'মিন পাপীদের সর্ববহৎ ও সর্বশেষ আশা হল শাফায়াত। তথাপি প্রভুর রোষানলে পতিত হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে এবং সর্বদা এ ভয় অন্তরে পোষণ করতে হবে যে, যদি বা এমন কোন কাজ করে ফেলে, যা দুর্ভোগময় পরিণাম ডেকে আনবে ও অন্তিমমুহূর্তে ঈমানহারা হয়ে যাবে; কিংবা যদি বা পার্থিব বিষয়ব র প্রতি হৃদয়ে এমন আকর্ষণ সৃষ্টি হয় যে, (আল্লাহ আমাদেরকে এ থেকে রক্ষা করুন) মহান আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়ে এ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করবে, আর তখনই জানতে পারবে যে, একমাত্র তিনিই (মহান আল্লাহ) তাদের ও তাদের মনোহারীদের মধ্যে মৃত্যুর মাধ্যমে বিভেদ সৃষ্টি করেন।

শাফায়াতের তাৎপর্য :

শাফায়াত যা شفع প্রকৃতি থেকে, জোড়া বা 'যুগল ' অর্থে গৃহীত হয়েছে। সাধারণের কথোপকথনে এরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয় যে, কোন সম্মানিত ব্যক্তি তার সম্মানের বিনিময়ে কোন অপরাধীকে তার শাস্তি থেকে নিস্কৃতি দিতে চায় অথবা কোন সেবকের পুরস্কার বৃ করতে চায়। সম্ভবতঃ এ ক্ষেত্রে শাফায়াত শব্দের ব্যবহারের কারণ হল এই যে, অপরাধী ব্যক্তির একাকী, ক্ষমালাভের যোগ্যতা নেই অথবা সেবকের একাকী বর্ধিত পুরষ্কারলাভের যোগ্যতা নেই; কিন্তু সুপারিশকারী বা শাফী'র (شفيع) সাথে প্রাগুক্তদের যুগল আবেদনের কারণে এ যোগ্যতা অর্জিত হয় ।

প্রচলিত নিয়মে, যে ব্যক্তি সুপারিশকারীর সুপারিশ গ্রহণ করেন, তা এ কারণে করেন যে, তিনি ভয় করেন যদি সুপারিশ গ্রহণ না করেন তবে সুপারিশকারী বিব্রত বোধ করবেন। আর এ বিব্রতবোধের ফলে তার (সুপারিশকারীর) আন্তরিকতা ও সেবা থেকে সুপারিশ গ্রহণকারী বঞ্চিত হতে পারেন বা তার পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। মুশরিকরা বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তাকে

মানবীয় গুণে গুণান্বিত করে থাকেন । যেমন : মনে করেন যে স্ত্রীর ভালবাসা, বিদূষক, সাহায্যকারী ও সহকারীর প্রয়োজন অথবা মনে করেন যে সৃষ্টিকর্তা অংশীদার ও সহকর্মীদের ভয়ে ভীত হন। তারা মহান আল্লাহর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে কিংবা তার রোষানল থেকে মুক্তিলাভের জন্যে কল্পিত খোদাদের আঁচলে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন এবং ফেরেশতা ও জিনদের পূজা- অর্চনায় আত্মনিয়োগ করেন; মূর্তি ও প্রতীমার নিকট শির নত করে, আর বলে :

(هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ)

এরাই আল্লাহর নিকট আমাদের জন্যে সুপারিশকারী। (ইউনুস- ১৮)[১৯১]

কিংবা বলে :

(مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى)

আমরা তো এদের পূজা এই জন্যেই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দিবে। (যুমার- ৩)

পবিত্র কোরান এ ধরনের অজ্ঞতাপ্রসূত ধারণার জবাবে বলে :

(لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ)

আল্লাহ ব্যতীত তার কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না। (আনয়াম- ৭০)

কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, এ ধরনের সুপারিশকারী ও তার সুপারিশ অস্বীকার করার অর্থ চূড়ান্তরূপে সুপারিশের অস্বীকৃতি নয়। বরং পবিত্র কোরানে আল্লাহর অনুমতিক্রমে সুপারিশের স্বপক্ষে অনেক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া সুপারিশকারী ও সুপারিশভুক্তদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে। আর অনুমোদিত সুপারিশকারীদের সুপারিশ মহান আল্লাহ কর্তৃক গৃহীত হবে। তাদের (শাফায়াতকারীদের) ভয়ে ভীত হওয়ার কারণে কিংবা তাদের নিকট

ঋণী বলে নয়, বরং এটা এমন এক মাধ্যম, যা মহান আল্লাহ্ তার ঐ সকল বান্দাদের জন্যে উন্মুক্ত করেছেন যারা তার পক্ষ থেকে ন্যূনতম করুণা লাভের যোগ্যতা রাখেন। আর এ জন্যে শর্ত ও মানদণ্ডসমূহও নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সঠিক সুপারিশ ও অংশীবাদী সুপারিশের প্রতি বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য সেরূপই, যেরূপ পার্থক্য মহান আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে বিলায়াত বা পরিচালনার বিশ্বাস ও স্বাধীনভাবে পরিচলানার বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে খোদাপরিচিতি পর্বে বর্ণিত হয়েছে ।[১৯২]

শাফায়াত শব্দটি কখনো কখনো আরও বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং সকল কল্যাণকর্ম, যা অপরের জন্যে মানুষ কর্তৃক সম্পাদিত হয়, তাকেও সমন্বিত করে। যেমন : পিতা- মাতা সন্তানের জন্যে, কিংবা সন্তান পিতা- মাতার জন্যে যা করে থাকে। অনুরূপ শিক্ষক বা সতর্ককারী ছাত্রদের জন্যে, এমনকি মুয়াযযিন তাদের জন্যে যা করে থাকেন, যারা তার আযান নে নামাযের কথা স্মরণ করতঃ মসজিদে গিয়ে থাকেন, এর সবই হল শাফায়াত। প্রকৃতপক্ষে যে সকল কল্যাণকর্ম পার্থিব জীবনে সম্পন্ন করা হয়েছে, তা- ই পরকালে শাফয়াতরূপে ও পথের দিশারূপে আত্মপ্রকাশ করে ।

অপর একটি বিষয় হল : পাপীদের জন্যে ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করাও এ পৃথিবীতে এক ধরনের শাফায়াত। এমনকি অপরের জন্যে দোয়া করা এবং তাদের অভাব পূরণ করার জন্যে মহান আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করাও প্রকৃতার্থে মহান আল্লাহ্র নিকট থেকে শাফায়াত বলে পরিগণিত হয়। কারণ এগুলোর সবকটিই অন্যের কল্যাণকরণ ও তাকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষাকরণের জন্যে মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মাধ্যমরূপে পরিগণিত হয় ।

শাফায়াতের মানদণ্ড :

যেমনটি ইতিপূর্বে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, শাফায়াতলাভ ও শাফায়াতকরণের জন্যে মূল শর্ত, মহান আল্লাহ্র অনুমতি লাভ করা। যেমন : পবিত্র কোরানে বর্ণিত হয়েছে :

(مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ)

কে সে, যে তার অনুমতি ব্যতীত তার নিকট সুপারিশ করবে ?” (সূরা বাকারা - ২৫৫)

(مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ)

তার অনুমতি লাভ না করে সুপারিশ করার কেউ নেই। (সূরা ইউনুস- ৩)

(يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا)

দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন ও যার কথা তিনি পছন্দ করবেন সে ব্যতীত, কারও সূপারিশ সেই দিন, কোন কাজে আসবে না । (তোহা- ১০৯)

(وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ)

যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ব্যতীত আল্লাহর নিকট কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। (সাবা- ২৩) উল্লেখিত আয়াতসমূহ থেকে সামগ্রিকভাবে ‘প্রভুর অনুমতির ’ শর্তটি প্রমাণিত হয়। কিন্তু অনুমতি প্রাপ্তদের শর্ত ও বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রমাণিত হয় না। তবে অন্যান্য আয়াতসমূহ থেকে দু’পক্ষের জন্যেই শর্তসমূহ সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় । যেমন :

(وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)

আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, সুপারিশের ক্ষমতা তাদের নেই, তবে যারা সত্য উপলব্ধি করে তার সাক্ষ্য দেয় তারা ব্যতীত। (যুখরুক- ৮৬)

সম্ভবতঃ من شهد بالحق এ সাক্ষি বলতে তাদেরকে বুঝায় যারা প্রভুর জ্ঞান ও শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের আমলসমূহ ও নিয়্যাতসমূহ সম্পর্কে অবগত হতে পারেন এবং তাদের আচরণের প্রকৃতি ও মূল্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারেন। যা হোক উল্লেখিত বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্পর্ক থেকে আমরা পাই : শাফায়াতকারীগণকে এমন জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে যে, শাফায়াত

লাভের জন্যে মানুষের যোগ্যতার মূল্যায়ন করতে সক্ষম। আর নিশ্চতরূপে যারা এ দু'শর্তের অধিকারী হয়েছেন তাদের অন্যতম হলেন মাসুমগণ (আ.)।

অপরদিকে অন্য কিছু আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, শাফায়াত লাভকারীদেরকে মহান আল্লাহর প্রিয়ভাজন হতে হবে । যেমন :

(وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى)

তারা সুপারিশ করে   ধু তাদের জন্যে যাদের প্রতি তিনি সন্তষ্ট। (সূরা আম্বিয়া- ২৮)

আকাশে কত ফেরেশতা আছে। তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসু হবে না যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তষ্ট তাকে অনুমতি না দেন। (নাজম- ২৬)

স্পষ্টতঃই শাফায়াতলাভকারীকে আল্লাহর প্রিয়ভাজন হতে হবে। এর অর্থ এ নয় যে, তার সকল কর্মই মহান আল্লাহর পছন্দ অনুযায়ী হবে। তাহলে তো শাফায়াতের কোন প্রয়োজনই ছিল না। বরং দ্বীন ও ঈমানের দৃষ্টিকোণ থেকে স্বয়ং ব্যক্তির প্রতি সন্তষ্ট অর্থে বুঝানো হয়েছে; যেভাবে হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে ।

অপরপক্ষে কিছু কিছু আয়াতে, যারা শাফায়াতলাভের যোগ্য নয় তাদের কথাও বর্ণিত হয়েছে । যেমন : পবিত্র কোরানে মুশরিকদের কথা উল্লেখ করতে যেয়ে বলা হয় :

(فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ)

পরিণামে, আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই। (য়ারা- ১০০)

এবং সূরা মুদাছিছরের (৪০- ৪৮) নং আয়াতে অপরাধীদের দোযখে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে (অপরাধীদেরকে) প্রশ্ন করা হলে তারা উত্তরে নামাযত্যাগ, [১৯৩] দুস্থ মানবতাকে সাহায্য না করা ও বিচার দিবসকে অস্বীকার করার মত বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা উল্লেখ করে। অতঃপর বলা হয় :

فما تنفعهم شفاعة الشّافعين

ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবেনা।

উল্লেখিত আয়াতসমূহ থেকে আমরা দেখতে পাই যে, মুশরিক ও ক্বিয়ামতকে অস্বীকারকারীরা, যারা মহান আল্লাহর ইবাদত করে না, অভাবগ্রস্তদেরকে সাহায্য করে না ও সঠিক নীতিতে বিশ্বাস করে– না, তারা কখনোই শাফায়াত লাভ করবে না । নবী (সা.)- এর পক্ষ থেকে ইস্তিগফারও এ পৃথিবীতে এক প্রকার শাফায়াত বলে পরিগণিত হয় এবং তার ইস্তিগফার, যারা তার নিকট ইস্তিগফার ও শাফায়াতের আবেদন জানাতে অপ্রস্তত তাদের জন্যে গ্রহণযোগ্য হবে না [১৯৪]- এর আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, শাফায়াতকে অস্বীকারকারীরাও শাফায়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়; যেমনটি হাদীসেও এসেছে [১৯৫]।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সি ান্তে উপনীত হতে পারি যে, প্রকৃত ও চূড়ান্ত শাফায়াতকারীকে মহান আল্লাহর অনুমোদন প্রাপ্তি ছাড়াও স্বয়ং পাপাচারী হতে পারবেন না এবং তাকে অপরের আনুগত্য ও পাপাচারের সঠিক মূল্যায়ন করার যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। আর এ ধরনের ব্যক্তিদের (শাফী) সঠিক অনুসারীরাও তার আলোকে সীমিত মাত্রার শাফায়াতকরণের অধিকারী হতে পারেন। যেমন : শহীদ ও সিদ্দীকীনের মত তার অনুসারীগণ এ যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হবেন।[১৯৬] অপরদিকে যারা মহান আল্লাহর অনুমতি ছাড়াও মহান অল্লাহ, তার নবীগণ (আ.) এবং যা কিছু মহান আল্লাহ তার পয়গাম্বরগণের (আ.) প্রতি অবতীর্ণ করেছেন যেমন : শাফায়াত ইত্যাদির প্রতি সঠিক বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করবেন, আর এ বিশ্বাস, আমৃত্যু সংরক্ষণ করবেন, তারাই শাফায়াতলাভের যোগ্যতাসম্পন্ন হবেন ।

২০তম পাঠ

কয়েকটি সমস্যার সমাধান

শাফায়াত সম্পর্কে একাধিক সমস্যা ও প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। আমরা আলোচ্য পাঠে এ অনুপপত্তিগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটির উপস্থাপন ও জবাব দেয়ার চেষ্টা করব।

অনুপপত্তি ১ : পবিত্র কোরানের বেশ কিছু আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, ক্বিয়ামতের দিবসে কারও সম্পর্কেই সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। যেমন :

(وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ)

তোমরা সেইদিনকে ভয় কর যেদিন কেউ কারও কোন কাজে আসবে না এবং কারও সুপারিশ স্বীকৃত হবে না এবং কারও নিকট হতে ক্ষতিপুরণ গৃহিত হবে না এবং তারা কোন প্রকার সাহায্য পাবে না । (বাকারা- ৪৮)

জবাব: প্রাগুক্ত ধরনের আয়াতসমূহ স্বাধীন ও শর্তহীন শাফায়াতকে অস্বীকার করণার্থে অবতীর্ণ হয়েছিল, যাতে কেউ কেউ বিশ্বাসী ছিল। এ ছাড়া উল্লেখিত আয়াতটি হল সর্ব সাধারণ অর্থের অধিকারী, যা আল্লাহর অনুমতিক্রমে ও নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে, শাফায়াতের স্বপক্ষে বর্ণিত আয়াতসমূহ কর্তৃক সীমাব হয়ে থাকে; যেমনটি পূর্ববর্তী পাঠে ইঙ্গিত করা হয়েছে ।

অনুপপত্তি -২: শাফায়াতের বৈধতার অপরিহার্য অর্থ হল, মহান আল্লাহ শাফায়াতকারীগণ কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে থাকেন। অর্থাৎ তাদের শাফায়াতই ক্ষমা লাভের (যা একমাত্র মহান আল্লাহরই অধিকার) কারণ হয়ে থাকবে।

জবাব: শাফায়াত বা সুপারিশ গ্রহণ করার অর্থ প্রভাবিত হওয়া নয়। যেমন : তওবাহ্ ও দোয়া কবুলকরণের সাথে এ ধরনের আবশ্যকতা বিবেচনা করা সঠিক নয়। কারণ এ বিষয়গুলোর মধ্যে সবকটি ক্ষেত্রেই বান্দাদের কর্মই আল্লাহর করুণা বা রহমত বর্ষণের ক্ষেত্র প্রস্তত করে। অর্থাৎ– পারিভাষিক অর্থে বলা হয় : “যোগ্যের যোগ্যতার শর্তাধীন, কর্তার কর্তৃতের শর্তাধীন নয়। ”

অনুপপত্তি -৩: শাফায়াতের অপরিহার্য অর্থ হল এই যে, শাফায়াতকারীগণ মহান আল্লাহ অপেক্ষা বেশী দয়ালু ! কারণ ধারণা করা হয় যে, যদি তাদের শাফায়াত না থাকত, তবে পাপীরা আযাবে পতিত হত কিংবা তাদের প্রতি আযাব অব্যাহত থাকত ।

জবাব: শাফায়াতকারীগণের দয়া বা করুণা হল মহান আল্লাহরই অসীম রহমতের আলোকচ্ছটা অর্থাৎ শাফায়াত হল, এমন এক মাধ্যম, যা মহান আল্লাহ স্বয়ং তার পাপিষ্ঠ বান্দাদেরকে ক্ষমা করার জন্যে নির্ধারণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে শাফায়াতের অবস্থান হল প্রভুর করুণাময় জ্যোতির শীর্ষতম পর্যায়ে, যা তার নির্বাচিত ও যোগ্য বান্দাগণের মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করে। যেমন : দোয়া, তাওবাহ্ ও চাহিদার যোগানও ক্ষমাপ্রাপ্তির অন্য এক মাধ্যম, যা মহান আল্লাহই মানুষের জন্যে উম্মুক্ত রেখেছেন ।

অনুপপত্তি -৪: অপর একটি সমস্যা হল এই যে, যদি পাপিষ্ঠদের শাস্তির ক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ প্রভুর ন্যায়পরায়ণতার দাবী হয়ে থাকে, তবে তাদের (পাপিষ্ঠদের) সুপারিশ গ্রহণ করা হল ন্যায়পরায়ণতার ব্যতিক্রম। যদি শাস্তি থেকে অব্যাহতি দান (যা শাফায়াত গ্রহনের ফল) ন্যায়ভিত্তিক হয়ে থাকে, তবে শাস্তির আদেশ (যা শাফায়াতের পূর্বে ছিল) হবে অন্যায় কর্ম।

জবাব: প্রভুর প্রত্যেকটি আদেশই (হোক সে শাস্তি শাফায়াতের পূর্বে কিংবা হোক সে শাফায়াতের পর শাস্তি থেকে মুক্তি দান) ন্যায় ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী হয়ে থাকে এবং উভয় ক্ষেত্রেই প্রজ্ঞা ও ন্যায়ভিত্তিক হওয়ার অর্থ পরস্পর বিপরীতের সমন্বয় নয়। কারণ ঐগুলোর উদ্দেশ্য (موضوع) বা ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। অর্থাৎ শাস্তির আদেশ হল, গুনাহে লিপ্ত হওয়ার ফল, যা গুণাহগারদের ক্ষেত্রে শাফায়াত ও এর গ্রহণযোগ্যতার কারণের দাবীকে অগ্রাহ্য বা বিবেচনা না করে প্রদান করা হয়। আর শাস্তি থেকে অব্যাহতি প্রদান হল উল্লেখিত কারণের দাবীর বহিঃপ্রকাশ। তা ছাড়া উদ্দেশ্যের (موضوع) পরিবর্তনে বিধেয়ের (حکم) পরিবর্তনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমরা প্রকৃতি জগতে সৃষ্টির নিয়মে ও বিধিগত নিয়মে লক্ষ্য করে থাকি। অনুরূপ যথাসময়ে রহিত আদেশের ন্যায়নিষ্ঠ হওয়ার ব্যাপারটি রহিতকরণের পর রহিতকারী আদেশের ন্যায়নিষ্ঠ হওয়ার সাথে কোন বিরোধ রাখে না।

তদনুরূপ দোয়া বা সদকার পূর্বে বালা বা দুর্যোগ নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাময়তা, দোয়া বা সাদকার পর তা অপসৃত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাময়তার সাথে কোন বিরোধ সৃষ্টি করে না।

সুতরাং শাফায়াতের পর পাপের ক্ষমাকরণও, শাফায়াতের পূর্বে শাস্তির আদেশের সাথে কোন বিরোধ রাখে না।

অনুপপত্তি -৫: মহান আল্লাহ শয়তানের অনুসরণকেই অপ্রত্যাশিত নরকযন্ত্রণা ভোগের কারণ বলে উল্লেখ করেছেন । যেমন :

(إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ)

বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তারা ব্যতীত আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা থাকবে না; অবশ্যই তোমার অনুসারীদের সকলেরই নির্ধারিত স্থান হবে জাহান্নাম। (হিজর- ৪২, ৪৩)

প্রকৃতপক্ষে পরকালে পাপীদেরকে শাস্তি প্রদান, প্রভুর নিয়মেরই অন্তর্ভুক্ত এবং প্রভুর নিয়মের কোন পরিবর্তন নেই। যেমন : পবিত্র কোরানে বলা হয় :

(فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا)

কিন্তু তুমি আল্লাহর বিধানের কখনো কোন পরিবর্তন পাবে না এবং আল্লাহর বিধানের কোন ব্যতিক্রমও দেখবে না। (ফাতির- ৪৩)

অতএব শাফায়াতের মাধ্যমে কিরূপে প্রভুর এ নিয়ম ভঙ্গ করা সম্ভব ?

জবাব: পাপীদের জন্যে শাফায়াতগ্রহণ করা মহান আল্লাহর অপরিবর্তনশীল নিয়মেরই অন্তর্ভূক্ত। এর ব্যাখ্যা হল : প্রভুর নিয়ম বাস্তব মানদণ্ড ও মাপকাঠির অনুগামী এবং কোন নিয়মই এর বিদ্যমানতা ও অবিদ্যমানতার শর্ত ও কারণের উপস্থিতিতে পরিবর্তন যোগ্য নয়। কিন্তু যে সকল বক্তব্য এ সকল নিয়মের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে, সে গুলো সাধারণতঃ উদ্দেশ্যের (موضوع) বিভিন্ন শর্তের অবতারণা সর্বদা করে না। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে এমনটি দেখতে পাওয়া যায়

যে, সংশ্লিষ্ট আয়াতের অর্থে একাধিক নিয়মের কথা উল্লেখ থাকে, যদিও প্রকৃতপক্ষে আয়াতের দৃষ্টান্ত হল স্বতন্ত্রতম কোন বিষয়, যা অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী মানদণ্ডের অনুগামী। অতএব সকল নিয়মই এর উদ্দেশ্যের বাস্তব শর্তের ভিত্তিতে (কেবলমাত্র ঐ সকল শর্তসাপেক্ষেই নয় যা বক্তব্য বা বিবৃতিতে এসেছে) অপরিবর্তনশীল ও অনঢ় । যেমন : শাফায়াত, যা বিশেষ ধরনের পাপীদের ক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় ও অলংঘনীয় নিয়ম, যারা নির্দিষ্ট শর্তের অধিকারী ও নির্দিষ্ট মানদণ্ডের আওতাধীন ।

অনুপপত্তি - ৬: শাফায়াতের প্রতিশ্রুতি, বিচ্যুতি ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের ঔ ত্য ও সাহস বৃ করে ।

জবাব: এ সমস্যাটি, তাওবা গ্রহণ ও পাপ মোচনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এর জবাব হল : শাফায়াত ও ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত হওয়া এমন কিছু শর্তের শর্তাধীন যে, পাপাচারী ঐগুলো অর্জনের ব্যাপারে নিশ্চিত আস্থা জ্ঞাপন করতে পারে না। যেমন : শাফায়াতের শর্তসমূহের মধ্যে একটি হল এই যে, ব্যক্তি জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত স্বীয় বিশ্বাস বা ঈমানের সংরক্ষণ করবে। আর কারো পক্ষেই এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। অপর দিকে যে ব্যক্তি কোন পাপাচারে লিপ্ত হল, যদি সে তার জন্যে ক্ষমা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন প্রকার প্রত্যাশাই না করতে পারে, তবে সে হতাশা ও নিরাশার জালে ধরা পড়বে। আর এ হতাশাই তার পাপকর্ম পরিত্যাগের প্রবণতাকে দুর্বল করে, তাকে বিচ্যুতি ও ভ্রান্তির পথে পরিচালিত করবে। এ কারণেই আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত শিক্ষকগণের পরিচর্যা ও প্রশিক্ষণের নিয়ম হল, মানুষকে সর্বদা আশা ও ভয়ের মাঝে রাখা - কেবলমাত্র রহমত ও করুণার ব্যাপারে আশস্ত না করা, যার ফলে সে প্রভুর রোষানল থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করবে কিংবা কেবলমাত্র আযাবের ভয় প্রদর্শন না করা, যা প্রভুর করুণা থেকে তাদেরকে নিরাশ করে ফেলবে। আর আমরা জানি যে, প্রভুর রহমত থেকে নিরাশ ও হতাশ হওয়া মহাপাপ বলে পরিগণিত হয় ।

অনুপপত্তি -৭: শাস্তি থেকে মুক্তিদানের ক্ষেত্রে শাফায়াতের ভূমিকার অর্থ হল সৌভাগ্য ও দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তির ব্যাপারে অপরের (শাফায়াতকারী) কর্মের প্রভাব। অথচ নিম্নল্লিখিত আয়াত থেকে আমরা দেখতে পাই যে, একমাত্র স্বীয় চেষ্টা ও শ্রমই, ব্যক্তিকে সৌভাগ্যশালী করে।

(وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى)

এবং নিশ্চয়ই মানুষের জন্যে তার শ্রম ব্যতীত কিছুই নেই।

জবাব: লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে ব্যক্তির প্রচেষ্টা ও শ্রম কখনো কখনো প্রত্যক্ষভাবে সম্পন্ন হয় এবং পথের প্রান্তরেখা পর্যন্ত চলতে থাকে। আবার কখনো কখনো পরোক্ষভাবে সম্পন্ন হয় এবং শর্ত ও মাধ্যমের যোগান পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। যে ব্যক্তি শাফায়াত লাভের অন্তর্ভুক্ত হয়, সে- ও সৌভাগ্যের সোপানে উন্নীত হওয়ার জন্যে প্রচেষ্টা ও শ্রম দিয়ে থাকে। কারণ ঈমান আনা ও শাফায়াতলাভের শর্তাধীন যোগ্যতা অর্জন করা, সৌভাগ্যের পথে পৌঁছার জন্যে প্রচেষ্টা বলে পরিগণিত হয়, যদিও হোক সে প্রচেষ্টা আংশিক ও অপ্রতুল। আর এ কারণেই (কোন কোন শাফয়াতলাভকারী) বারযাখ ও পুনরুত্থানের ময়দানে কিছুটা কষ্ট- ক্লেশ ভোগ করবে। কিন্তু যে কোন ভাবেই হোক না কেন, স্বয়ং ব্যক্তিই সৌভাগ্যের মূল, স্বীয় হৃদয়পটে বপন করেছে এবং কখনো কখনো স্বীয় সুকর্মের মাধ্যমে তাতে পানি সরবরাহ করেছে, যাতে পার্থিব জীবনের অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত তা কিয়ে না যায়। অতএব চূড়ান্ত সৌভাগ্য, তার শ্রম ও প্রচেষ্টার সাথেই সম্পর্কিত, যদিও শাফায়তকীরগণও ঐ বৃক্ষকে ফলপ্রসূকরণের ক্ষেত্রে এক প্রকার ভূমিকা রেখে থাকেন। যেমন : এ পৃথিবীতেও কেউ কেউ অপরের হিদায়াত ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখে থাকেন। কিন্তু তাই বলে তাদের ভূমিকা ব্যক্তির প্রচেষ্টা ও শ্রমকে অগ্রাহ্য করে না।

সমাপ্ত

তথ্যসূত্র :

১। বাকারা- ৪, লোকমান- ৪, নামল- ৩।

২। ইসরা - ১০, ফোরকান - ১১, সাবা- ৮, মু ’ মিনুন- ৭৪।

৩। আর রাহমান - ৪৬ থেকে শেষ পর্যন্ত, ওয়াক্বিয়াহ- ১৫, ৩৮, দাহর - ১১, ২১।

৪। আল্ হাক্বাহ - ২০, ২৭, আল্ মূলক ৬- ১১, ওয়াক্বিয়াহ ৪২- ৫৬।

৫। সাদ- ২৬, সিজদাহ- ১৪০।

৬। সূরা নামল- ৬৮, আহক্বাফ- ১৭।

৭। এ প্রশ্নটির পূর্বে অপর একটি প্রশ্নও আসতে পারে। যেমন : মূলতঃ কোন নির্দিষ্ট সমষ্টির একত্বের ভিত্তি কী ? রাসায়নিক ও জৈবরাসায়নিক যৌগসমূহ কিসের ভিত্তিতে অভিন্ন অস্তিত্বরূপে পরিগণিত হতে পারে? কিন্তু আলোচনা দীর্ঘায়িত না করার স্বার্থে, এসকল প্রশ্নের উল্লেখকরণ থেকে বিরত থাকলাম। দ্রষ্টব্য : অমূজেশে ফালসাফেহ্, প্রথম খণ্ড।

৮। উল্লেখ্য, এ শব্দগুলোর প্রতিটিরই অন্যান্য পরিভাষাগত অর্থও বিদ্যমান। তবে এখানে এগুলোর মানে হল সেই প্রকারণগত গঠন (صورت نوعية) ।

৯। সম্ভবতঃ এ ভ্রান্ত ধারণা থাকতে পারে যে, রূহ ও পুনরুত্থানের বিষয়কে ওহীর মাধ্যমে প্রমাণ করাটা আবর্তচক্রিক (vicious circle) যুক্তি প্রদর্শন করার শামিল। কারণ যে সকল দলিল, নবুয়্যতের প্রয়োজনীয়তাকে প্রমাণের জন্যে উপস্থাপন করা হয়েছে, সেগুলোতেই পরকালীন জীবনকে) যা রূহের উপর নির্ভরশীল (আসল বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ফলে ওহী ও নবুয়্যতের মাধ্যমে এ মূলের স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন আবশ্যকীয় রূপে আবর্তচক্রিক হবে।

কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, ওহীর মাধ্যমে যুক্তি প্রদর্শনের সঠিকতা ‘নবুয়্যতের প্রয়োজনীয়তা ’ সম্পর্কিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে না; বরং এর (নবুয়্যতের) বাস্তবায়নের উপর নির্ভরশীল, যা মু’জিযাহর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। আর যেহেতু স্বয়ং পবিত্র কোরানই মু’জিযাহ এবং

ইসলামের নবী (সা.)- এর সত্যতার স্বপক্ষে দলিল স্বরূপ, সেহেতু রূহ ও মাআদের প্রতিপাদনে এর মাধ্যমে যুক্তি উপস্থাপন সঠিক।

১০। উল্লেখ্য, দর্শনে নাফস যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তা আখলাকে ব্যবহৃত নাফেসর ব্যতিক্রম। কারণ আখলাকের পরিভাষায় একে বু ি বৃত্তির প্রতিকূলে ব্যবহার করা হয়।

১১। প্রভুর ন্যায়পরায়ণতা বিষয়ক আলোচনায় (প্রথম খণ্ডের ২০ নং পাঠে) বলা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে ন্যায়পরায়ণতা হল প্রজ্ঞারই একটি দৃষ্টান্ত। এর আলোকে এ দলিলটিকেও প্রকারান্তরে প্রজ্ঞাভিত্তিক দলিলেরই একটি বলে মনে করা যেতে পারে।

১২। মু ’ মিনুন - ১৭, নিসা- ১৫৭, আনআম - ১০০, ১১৯, ১৪৮, কাহাফ- ৫, হজ্ব- ৩, ৮, ৭১, আনকাবুত- ৮, রূম- ২৯, লোকমান- ২০, গাফির - ৪২, যোখরুফ- ২০, নাজম- ২৮।

১৩। ক্বাসাস- ৩৯, কাহাফ- ৩৬, সাদ- ২৭, জাছিয়া - ৩২, ইনশিক্বাক - ১৪।

১৪। আল ক্বিয়ামাহ- ৫।

১৫। রূম- ১০, মোতাফফিফীন (১০- ১৪)।

১৬। নাহল- ৩৮।

১৭। যে সকল বিষয় পরস্পরের উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সে সকল বিষয় ঠিক ঐ বিশেষ উদাহরণগত দিক থেকেই অভিন্ন নির্দেশের অধিকারী হোক সে এ নির্দেশের সম্ভাবনা থাকুক বা না থাকুক : حكم الامثال فى ما يجوز و ما لا يجوز واحد

১৮।হুদ- ৭, ইসরা- ৫১, সাফফাত- ১৬, ৫৩, দুখান- (৩৪- ৩৬), আহক্বাফ- ১৮, ওয়াক্বিয়াহ (৪৭- ৪৮), ক্বাফ- ৩, মুতাফফিফীন (১২- ১৩), নাযিয়াত (১০- ১১)।

১৯। আ’রাফ- ৫৭, হাজ্জ- (৫- ৬), রূম- ১৯, ফাতির- ৯, ফুসসিলাত- ১৯, যুখরূফ- ১১, ক্বাফ- ১১।

২০। বাকারা- ২৬০।

২১। বাকারা- ২৫৯।

২২। বাকারা- (৫৫- ৫৬)।

২৩। আল ইমরান - ৪৭ , মায়িদাহ- ১১০

২৪। সেজদা- (১০- ১১)।

২৫। এছাড়াও : সূরা ইয়াসীন- ৮১, ইসরা- ৯৯, আসসাফফাত - ১১, আন- নাযিয়াত- ২৭, দ্রষ্টব্য।

২৬। অনুরূপ আনকাবুত (১৯- ২০), ক্বাফ- ১৫, ওয়াক্বিয়াহ- ৬২, ইয়াসীন- ৮০, হাজ্জ- ৫, আল- ক্বিয়াম- ৪০, আত- তারিক- ৮।

২৭। এছাড়াও দেখুন : আল ইমরান- ৯, ২৫, নিসা- ৮৭, আনআম- ১২, কাহাফ- ২১, হাজ্জ- ৭, শূরা- ৭, জাছিয়া- ২৬, ৩২।

২৮। এছাড়াও দেখুন : আল ইমরান- ৯, ১৯১, নিসা- ১২২, ইউনুস- ৪, ৫৫, কাহাফ- ২১, আম্বিয়া- ১০৩, ফুরকান- ১৬, লুকমান- ৯, ৩৩, ফাতির- ৫, যুমার- ২০, নাজম- ৪৭, জাছিয়া- ৩২, আহক্বাফ- ১৭, দ্রষ্টব্য।

২৯। অনুরূপ দেখুন : ইউনূস- ৫৩, সাবা- ৩, দ্রষ্টব্য।

৩০। আনআম- ১৩০, ১৫৪, রা ’ দ- ২, শূরা- ৭, যুখরুফ- ৬১, যুমার- ৭১, দ্রষ্টব্য।

৩১। ইসরা- ১০, সাবা- ৮, মু ’ মিনুন- ৭৪, দ্রষ্টব্য।

৩২। সুরা সাদ - ২৮, গাফির - ৫৮, কালাম - ৩৫, ইউনুস - ৪।

৩৩। এছাড়া সূরা আনয়াম - ৯৩ দ্রষ্টব্য

৩৪। এছাড়া সূরা মুহাম্মাদ (সা.) - ২৭ দ্রষ্টব্য

৩৫। স্মরণ রাখতে হবে যে, পবিত্র কোরান তাদের প্রত্যাবর্তনকেই অস্বীকার করে, যারা সমস্ত জীবন কুফর ও গুনাহের মাঝে অতিবাহিত করেছিল এবং মৃত্যুর সময় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের ও গুণাহমোচনের ইচ্ছা পোষণ করে। এছাড়া ও কিয়ামতের মাঠ থেকে ফিরে আসাকে সম্পূর্ণ রূপে নিষি ঘোষণা করে। আর এ নেতিবাচকতার অর্থ এ নয় যে, সমস্ত প্রত্যাবর্তন কেই অস্বীকার করে। কারণ যেমনটি ইতিপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এমনও কেউ ছিলেন যে দ্বিতীয়বার এ

পৃথিবীতেই ফিরে এসেছিলেন এবং শিয়া বিশ্বাস মতে ইমামে যামান (আ.)- এর আবির্ভাবের পরও একদল পুনরায় এ পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন (رجعت) করবে।

৩৬। আনয়াম- (২৭- ২৮)।

৩৭। যিলযাল- ১, হাজ্জ- ১, ওয়াক্বিয়াহ- ৪, মুযাম্মিল- ১৪।

৩৮। যিলযাল- ২, ইনশিক্বাক- ৪।

৩৯। আল হাক্বা- ১৪, ফাজর- ২১।

৪০। তাকভির- ৬, ইনফিতার- ৩।

৪১। কাহফ- ৪৭, নাহল- ৮৮, তাহুর- ১০, তাকভির- ২।

৪২। আল হাক্বা- ১৪, ওয়াকিয়াহ- ৫।

৪৩। মুযাম্মিল- ১৪।

৪৪। মায়ারিজ- ৯, ক্বারিয়াহ- ৫।

৪৫। তোহা- (১০৫- ১০৭), মুরসিলাত- ১০।

৪৬।। কাহফ- ৮, নাবা- ২০।

৪৭। আল ক্বিয়ামাহ- ৮।

৪৮। তাকভির- ১।

৪৯। তাকভির- ২।

৫০। ইনফিতার- ২।

৫১। আল ক্বিয়ামাহ- ৯।

৫২। তূর- ১, আল হাক্বা- ১৬।

৫৩। আর রাহমান- ৩৭, আল হাক্বা- ১৬, মুযাম্মিল- ১৮ মূরসিলাত- ৯, নাবা- ১৯, ইনফিতার- ১, ইনশিক্বাক- ১।

৫৪। আম্বিয়া- ১০৪, তাকভির- ১১।

৫৫। মায়ারিজ- ৮।

৫৬। ফুরকান- ২৫, দূখান- ১০।

৫৭। যুমার- ৬৮, আল হাক্বা- ১৩, ইয়াসীন- ৪৯।

৫৮। নামল- ৮৭- ৮৯।

৫৯। ইব্রাহীম- ৪৮, যূমার- ৬৭, মারিয়াম- ৩৮, ক্বাফ- ২২।

৬০। যূমার- ৬৯।

৬১। যূমার- ৬৮, কাহফ- ৯৯, ক্বাফ- ২০, ২৪, নাবা- ১৮, নাযিয়াত- ১৩- ১৪, মুদাছছির- ৮, সাফফত- ১৯।

৬২। আনআম- ৩৮, তাকভির- ৫।

৬৩। কাহফ- ৪৭, নাহল- ৭৭, ক্বামার- ৫০, নাবা- ১৮।

৬৪। ক্বাফ- ২০।

৬৫। কারিয়াহ- ৪, ক্বামার- ৭।

৬৬। ক্বাফ- ৪৪, মায়ারিজ- ৪৩।

৬৭। ইয়াসীন- ৫১, মুতাফফিফীন- ৩০, আল ক্বিয়ামাহ- ১২, ৩০, এছাড়া ((لقاء الله)(نشر) (حشر) (رد الى الله) (رجوع الى الله)) ইত্যাদি আয়াতসমূহ দ্রষ্টব্য।

৬৮। কাহফ- ৯৯, তাগাবুন- ৯ , নিসা- ৮৭, আনআম- ১২, আলে ইমরান- ৯, হুদ- ১০৩।

৬৯। রূম- ৫৫, নাযিয়াত- ৪৬, ইউনুস- ৪৫, ইসরা- ৫২, তোহা- ১০৩- ১০৪, মু ’ মিনূন- ১১৩, আহক্বাফ- ৩৫।

৭০। ইব্রাহীম- ২১, আল আদিয়াত- ১০, আত ত্বারিক- ৯, ক্বাফ- ২২, আল হাক্বাহ- ১৮।

৭১। হাজ্জ- ৫৬, ফুরকান- ২৬, গফির- ১৬, ইনফিতার- ১৯।

৭২। হুদ- ১০৫, তোহা- ১০৮, ১১১, নাবা- ৩৮।

৭৩। আবাসা- (৩৪- ৩৭), য়ারা- ৮৮, মায়ারিজ- (১০- ১৪), লুকমান - ৩৩।

৭৪। বাকারা- ১৬৬, মু ’ মিনুন- ১০১।

৭৫। যুখরূফ- ৬৭।

৭৬। আনআম- ৩১, মারিয়াম- ৩৯ , ইউনুস- ৫৪।

৭৭। আলে ইমরান- ৩০, তাকভির- ১৪, ইসরা- ৫৪।

৭৮। আলে ইমরান- ১৩, ১৪, ৭১ আল হাক্বাহ- ১৯, ২৫ ইনশিক্বাক- ৭, ১০।

৭৯। আর রাহমান- ৩৯।

৮০। যুমার- ৬৯, বাকারা- ১৪৩, আল ইমরান- ১৪০, নিসা- ৪১, ৬৯, হুদ- ১৮, হাজ্জ- ৭৮, ক্বাফ- ২১, নাহল- ৮৪, ৮৯।

৮১। নূর- ২৪, ইয়াসীন- ৬৫, ফুসসিলাত ২০- ২১।

৮২। আ'রাফ- ৮, ৯, আম্বিয়া- ৪৭, মু ' মিনূন- ১০২- ১০৩ কারিয়াহ ৬- ৮।

৮৩। ইউনূস ৫৪, ৯৩, জাসিয়াহ- ১৭, নামল- ৭৮, যুমার ৬৯- ৭৫।

৮৪। আন্ নাজম- ৪০- ৪১, বাকারা- ২৮১, ২৮৬, আলে ইমরান- ২৫, ১৬১, আনআম- ৭০, হুদ- ১১১, ইব্রাহীম- ৫১, তোহা- ১৫, গাফির- ১৭, যাছিয়াহ- ২২, তূর- ২১, মুদাছছির- ৩৮, ইয়াসীন- ৫৪, যুমার- ২৪।

৮৫। আনআম- ১৬০।

৮৬। আন্ নাজম- ৩৯, আনআম- ১৬৪, ফাতির- ১৮, যুমার- ৭।

৮৭। আন্ নাহল- ২৫, আনকাবুত- ১৩, প্রসঙ্গক্রমে এখান থেকেই আমরা ধারণা করতে পারি যে, যারা অপরের হিদায়াতের কারণ হয় তারা অতিরিক্ত ছওয়াবের অধিকারী হবে, যেমনটি স্পষ্টরূপে রেওয়াতে এসেছে।

৮৮। বাকারা- ৪৮- ১২৩, আলে ইমরান- ৯১, লুকমান- ৩৩, মায়িদাহ- ৩৬, হাদীদ- ১৫।

৮৯। বাকারা- ৪৮, ১২৩, ২৫৪, মূদচ্ছির- ৪৮।

৯০। আম্বিয়া- ২৮, বাকারা- ২৫৫, ইউনুস- ৩, মারিয়াম- ৭৮, তোহা- ১০৯, সাবা- ২৩, যুখরুফ- ৮৬, আননাজম- ২৬

৯১। আ'রাফ- ৪৪।

৯২। আনফাল- ৩৭, রূম- ১৪- ১৬, ৪৩, ৪৪, রা- ৭, হুদ ১০৫- ১০৮, ইয়াসীন- ৫৯।

৯৩। যুমার- ৭৩, আলে ইমরান- ১০৭, মারিয়াম- ৮৫, আল ক্বিয়ামাহ- ২৪- ৪২, মুতাফফিফীন- ২৪, গাশিয়াহ- ৮, আবাসা- ৩৮, ৩৯।

৯৪। যুমার- ৬০, ৭১ আলে ইমরান- ১০৬, আনআম- ১২৪, ইউনুস- ২৭ মারিয়াম- ৮৬, তোহা- ১০১, ১২৪- ১২৬, ইব্রাহীম- ৪৩ ক্বামার- ৮, মুয়ারিজ- ৪৪, গাশিয়াহ- ২, ইসরা- ৭২, ৯৭, আবাসা- ৪০, ৪১।

৯৫। মারিয়াম ৭১- ৭২।

৯৬। হাদীদ- ১২।

৯৭। হাদীদ ১৩- ১৫, নিসা ১৪০।

৯৮। যুমার- ৭৩, রাদ ২৩- ২৪।

৯৯। যুমার ৭১- ৭২ , তাহরীম - ৬, আম্বিয়া - ১০৩।

১০০। আলে ইমরান - ১৩৩, হাদীদ ২১।

১০১। আল হাক্বাহ - ২৩, আদদাহর - ১৪ , নাবা - ৩২।

১০২। তাওবাহ - ৭২, ফুরকান - ৭৫ , যুমার - ২০ , সাবা - ৩৭।

১০৩। বাকারা - ২৫, আলে ইমরান - ১৫, এবং আরও শতশত আয়াত।

১০৪। মুহাম্মদ - ১৫, আদ্ দাহার ৬, ১৮, ২১, মুতাফফিফীন - ২।

১০৫। নাহল - ৩১, ফুরকান - ১৬, যুমার - ৩৪, ফুছিছলাত - ৩১, রা - ২২, যুখরুফ - ৭১।

১০৬। ক্বাফ - ৩৫।

১০৭। কাহফ - ৩১, হাজ্জ - ২৩, ফাতির - ৩৩, দুখান - ৫৩, দাহর - ২১, আ'রাফ - ৩২।

১০৮। হিজর - ৪৮, কাহফ- ৩১, সাফফাত- ৪৪, তূর- ২০ , আর রাহমান - ৫৪, ৭৬, ওয়াকিয়াহ - ১৫, ১৬, গাশিয়াহ - ১৩- ১৬, ইয়াসীন - ৫৬।

১০৯। আ'রাফ - ৪৩, ইউনুস - ১০, ফাতির - ৩৪, যুমার - ৭৪।

১১০। মারিয়াম - ৬২, নাবা - ৩৫, গাশিয়াহ - ১১।

১১১। দাহ্‌র - ১৩।

১১২। ফাতির - ৩৫, হিজর - ৪৮।

১১৩। যুখরুফ - ৬৮, আহক্বাফ - ১৩ , আ'রাফ - ৩৫, ৪৯, ফুছ্ছিলাত - ৩॥

১১৪। আ'রাফ - ৪৩, হিজর - ৪৭।

১১৫। তূর - ২৪, ওয়াকিয়াহ - ১৭, দাহ্‌র - ১৯।

১১৬। সাফফাত ৪৫- ৪৭, সাদ - ৫১, তূর - ২৩, যুখরুফ - ৭১ , ওয়াকিয়াহ ১৮, ১৯ দাহ্‌র ৫, ৬ , ১৫- ১৯, নাবা - ৩৪, মুতাফফিফীন ২৫- ২৮।

১১৭। সাদ - ৫১, তূর - ২২, আর রাহমান - ৫২, ৬৮, ওয়াকিয়াহ ২০, ২১, মুরসিলাত - ৪২, নাবা- ৩২।

১১৮। বাকারা - ২৫, আলে ইমরান - ১৫, নিসা - ৫৭ , সাফফাত - ৪৮, ৪৯ সাদ- ৫২, যুখরুফ - ৭০ দুখান - ৫৪, তূর- ২০ , আর রাহমান- ৫৬, ৭০- ৭৪ , ওয়াকিয়াহ ২২, ২৩, ৩৪- ৩৭ নাবা- ৩৩।

১১৯। আলে ইমরান - ১৫, তাওবা - ২১, ৭২, হাদীদ - ২০, মায়িদাহ - ১১৯ মুযাদিলাহ - ২৯ , বায়্যিনাহ - ৮।

১২০। সিজদাহ - ১৭।

১২১। বাকারা ২৫- ৮২, আলে ইমরান - ৩৬, ১০৭, ১৯৮, নিসা- ১৩, ৫৭, ১২২, মায়িদাহ - ৮৫, ১১৯ আ'রাফ - ৪২ তাওবা- ২২, ৭২, ৮৯, ১০০, ইউনুস- ২৬, হুদ - ২৩, ১০৮, ইব্রাহীম- ২৩, হিজর- ৪৮, কাহফ- ৩, ১০৮, তোহা- ৭৬, আম্বিয়া- ১০২, মু ' মিনুন- ১১, ফুরকান- ১৬, ৭৬ আনকাবুত - ৫৮, লুকমান - ৯, যুমার - ৭৩, যুখরুফ - ৭১, আহক্বাফ- ১৪, ক্বাফ - ৩৪, সাফফাত - ৫, হাদীদ - ১২, মুজাদিলাহ- ২২, তাগাবুন - ৯, তালাক - ১১, বায়্যিনাহ- ৮।

১২২। দুখান - ৫৬, (ফুছ্ছিলাত - ৮, ইনশিক্বাক - ২৫, তীন - ৬)।

১২৩। নিসা - ১৪০ ইত্যাদি।

১২৪। ক্বাফ - ৩০।

১২৫। হুদ - ১০৬ আম্বিয়া - ১০০, ফুরকান - ১২, মুলক ৭- ৮।

১২৬। আলে ইমরান - ১০৬, মূলক - ২৭ ইউনুস - ২৭, মু ’ মিনুন - ১০৪, যূমার- ৬০।

১২৭। তাহরীম - ৬।

১২৮। রা’দ- ৫, ইব্রাহীম - ৪৯, সাবা - ৩৩, গাফির- ৭১, ৭২, আল হাককাহ- ৩২, দাহর - ৪।

১২৯। ইব্রাহীম - ৫০, ফুরকান - ১৩, আম্বিয়াহ - ৩৯, হামযাহ - ৬, ৭।

১৩০। বাকারা - ২৪, আলে ইমরান - ১০, আম্বিয়া - ৯৮, জীন - ১৫, তাহরীম - ৬।

১৩১। ফুরকান - ১৩, ১৪, ইনশিক্বাক - ১১।

১৩২। হাজ্জ - ১৯ , ২০, দুখান - ৪৮।

১৩৩। আনআম - ৭০, ইউনুস - ৪, কাহাফ - ২৯, ওয়াকিয়াহ - ৪২- ৪৪, ৫৫, মুহাম্মাদ - ১৫।

১৩৪। সাফফাত- ৬২- ৬৬, সাদ- ৫৭, দুখান- ৪৫, ৪৬, ওয়াকিয়াহ- ৫২, ৫৩, নাবা- ২৫, গাশিয়াহ - ৬, ৭।

১৩৫। ইব্রাহীম - ৫০, হাজ্জ - ১৯।

১৩৬। যুখরুফ - ৩৮, ৩৯, য়ারাহ - ৯৪, ৯৫, সাদ - ৮৫।

১৩৭। আ’রাফ - ৩৮, ৩৯, আনকাবুত - ২৫, আহযাব - ৬৮, সাদ ৫৮- ৬৪।

১৩৮। মুমিনুন- ১০৮, রূম - ৫৭, গাফির - ৫২, মুরসিলাত - ৩৫, ৩৬।

১৩৯। গাফির - ৪৯, ৫০।

১৪০। যুখরুফ - ৭৭।

১৪১। ইব্রাহীম - ১৭, তোহা - ৭৪, ফাতির - ৩৬।

১৪২। নিসা - ৫৬।

১৪৩। আ’রাফ - ৫০।

১৪৪। মুদাছছির ৩৯- ৪৭।

১৪৫। সাদ ৫৯- ৬৪।

১৪৬। আ’রাফ - ৩৮, ৩৯, সাফফাত ২৭- ৩৩, ক্বাফ - ২৭, ২৮।

১৪৭। ইব্রাহীম - ২১, সাবা- (৩১- ৩৩)।

১৪৮। ইব্রাহীম- ২২।

১৪৯। বাকারা- ৩৯ , ৮১, ১৬২, ২১৭, ২৫৭, ২৭৫, আলে ইমরান- ৮৮, ১১৬, নিসা- ১৬৯, মায়িদাহ- ৩৭, ৮০, আনআম- ১২৮, আরাফ- ৩৬, তাওবাহ- ১৭, ৬৩, ৬৮, ইউনুস- ২৭, ৫২ হূদ- ১০৭ রাদ- ৫ নাহল- ২৯, কাহফ- ১০৮, তোহা- ১০১, সাজদাহ- ২০ মু ’ মিনূন- ১০৩, আহযাব- ৬৫, যুমার- ৭২, গাফির- ৭৬, যুখরুফ- ৭৪, মুজাদিলাহ- ১৭, তাগাবুন- ১০, জীন- ২৩, বায়্যিনাহ- ৬।

১৫০। বেহেশত ও দোযখের চিরন্তনতা সম্পর্কিত আয়াত দ্রষ্ঠব্য ।

১৫১। কাহাফ- ৪৬, মারিয়াম- ৭৬, তোহা- ৭১, ১৩১, ক্বাসাস- ৬০, রা- ৩৬, গাফির- ৩৯, আ’লা- ১৭।

১৫২। আলে ইমরান - ১৯৭, নিসা- ৭৭, তওবাহ - ৩৮, নাহল - ১১৭।

১৫৩। ইউনুস - ২৪, কাহফ - ৪৫, ৪৬, হাদীদ - ২০।

১৫৪। আলে ইমরান- ১৫, নিসা- ৭৭, আনআম- ৩২, আ’রাফ- ৩২, ইউসুফ- ১০৯, নাহাল- ৩০, ইসরা- ২১, কাহফ- ৪৬, মারিয়াম- ৭৬, তোহা- ৭৩, ১৩১, ক্বাসাস- ৬০, রা- ৩৬, আ ’ লা- ১৭।

১৫৫। রা ’ দ- ৩৪, তাহা- ১২৭, সেজদাহ- ২১, যুমার- ২৬, ফুছিছলাত- ১৬, কালাম- ৩৩, গাশিয়াহ- ২৪।

১৫৬। ক্বাসাস- ৭৭।

১৫৭। আলে ইমরান- ১৮৫, আনকাবুত- ৬৪, মুহাম্মদ- ৩৬, হাদীদ- ২০।

১৫৮। আনকাবূত- ৬৪, ফাজর- ২৪।

১৫৯। আ’লা (১৬- ১৭)।

১৬০। হুদ- ২২, কাহফ ১০৪- ১০৫, নামল ৪- ৫।

১৬১। বাকারা- ১০২, ২০০, তওবাহ- ৩৮, রূম- ৩৩, ফাতির- ৫, রা- ২০ যুখরূফ (৩৪- ৩৫)।

১৬২। ইসরা- ১০, বাকারা- ৮৬, আনয়াম- ১৩০, ইউনুস- ৭- ৮, হূদ- ১৫- ১৬ ইব্রাহীম- ৩, নাহল- ২২, ১০৭ মু ’ মিনূন- ৭৪, নামল- ৪- ৫, ৬৬, রূম- ৭, ১৬, লুকমান- ৪, সাবা- ৮, ২১, যুমার- ৪৫, ফুছিছলাত- ৭, নাযিয়াত ৩৮- ৩৯।

১৬৩। নাবা- ৪০।

১৬৪। স্মরণ রাখতে হবে যে, পবিত্র কোরানে পার্থিব পুরস্কার ও শাস্তির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু পরিপূর্ণ ও অশেষ পুরস্কার ও শাস্তি কেবলমাত্র আখেরাতের জন্যেই নির্ধারিত ।

১৬৫। সাবা- ৩৭।

১৬৬। য়ারা- ৮৮, লুকমান - ৩৩, আল ইময়ান- ১০, ১১৬, মুজাদিলাহ- ৯৭।

১৬৭। বাকারা- ১৬৬, মু ’ মিনুন- ১০১।

১৬৮। আনআম- ৯৪।

১৬৯। মারিয়াম- ৮০, ৯৫।

১৭০। রা’দ- ২৩, গাফির- ৮, তূর- ২১।

১৭১। বাকারা- ২০০, আল ইমরান- ৭৭, ইসরা- ১৮, রা- ২০, আহক্বাফ- ২০।

১৭২। যুখরুফ- ৩২।

১৭৩। আনফাল- ২৮, আম্বিয়া- ৩৫, তাগবুন- ১৫, আরাফ- ১৬৮, কাহাফ- ৭, মায়িদাহ- ৪৮, আনআম- ১৬৫, নামল- ৪০, আলে ইমরান- ১৮৬।

১৭৪। আলে ইমরান- ১৭৯, মু ’ মিনূন- ৫৬, ফাজর (১৫- ১৬)।

১৭৫। বাকারা- ২৫, ৩৮, ৬২, ৮২, ১০৩, ১১২, ২৭৭, আলে ইমরান- ১৫, ৫৭, ১১৪- ১১৫, ১৩৩, ১৭৯, ১৯৫, ১৯৮, নিসা, ১৩, ৫৭, ১২২, ১২৪, ১৪৬, ১৫২, ১৬২, ১৭৩, মায়িদা - ৯, ৬৫, ৬৯, আনআম- ৪৮, তাওবাহ- ৭২, ইউনুস- ৪, ৯, ৬৩, ৬৪, রা ’ দ- ২৯, ইব্রাহীম- ২৩, নাহল- ৯৭, কাহফ- ২, ২৯- ৩০, ১০৭, তোহা- ৭৫, হাজ্জ- ১৪, ২৩, ৫০, ৫৬, ফুরকান- ১৫, আনকাবূত- ৭, ৯, ৫৮, রূম- ১৫, লুকমান- ৮, সাজদাহ- ১৯, সাবা- ৪, ৩৭, ফাতির- ৭ সাদ- ৪৯, যুমার- ২০, ৩৩- ৩৫, গাফির- ৪০, ফুসসিলাত- ৮, রা- ২২, ২৬, জাসিয়া-

৩০, ফাতহ- ১৭, হাদীদ- ১২, ২১, তাগাবুন- ৯, তালাক- ১১, ইনশিক্কাক- ২৫, বুরূজ- ১১, তীন- ৬, বায়্যিনাহ (৭- ৮)।

১৭৬। বাকারা- ২৪, ৩৯, ৮১, ৮৬, ১০৪, ১৬১, ১৬২, আলে ইমরান- ২১, ৫৬, ৮৬- ৮৮, ৯১, ১১৬, ১৩১, ১৭৬, ১৭৭, ১৯৬, ১৯৭, নিসা, ১৪, ৫৬, ১২১, ১৪৫, ১৫১, ১৬১, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৩, মায়িদাহ - ১০, ৩৬, ৭২, ৮৬, আনআম- ৪৯, তাওবাহ - ৩, ৬৮, ইউনুস- ৪, ৮ রা'দ- ৫, কাহফ ১০৫- ১০৬, হাজ্জ- ১৯, ৫৭, ৭২, ফুরকান- ১১, নামল- ৪- ৫, আনকাবুত- ২৩, সাদ- ৫৫, যুমার- ৩২, গাফির- ৬, রা- ২৬, জাসিয়া- ১১, ফাতহ- ১৩, ১৭ হাদীদ- ১৯, মুজাদিলাহ- ৫, তাগাবুন- ১০, মুলক- ৬, ইনশিক্কাক ২২- ২৪, গাশিয়াহ ২৩- ২৪, বায়্যিনাহ- ৬।

১৭৭। পবিত্র কোরানে (اجر) কথাটি প্রায় ৯০ বার এবং (جزاء) ও এর পরিবাবের সদস্যদের কথা শতাধিকবার এসেছে ।

১৭৮। এ ছাড়া ইসরা- ১৮, রা- ২০, আহক্কাফ- ২০ ইত্যাদি আয়াত দ্রষ্টব। এ আয়াতসমূহের আলোকে তাদের ইসলাম পরিচিতির মানদণ্ড সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়, যারা পাশ্চাত্যের কোন কোন কাফের ও নাস্তিক পণ্ডিতদেরকে খাজা নাসিরুদ্দিন তুসী ও আল্লামা মাজলেসীর মত শিয়া আলেমগণের উপর প্রাধান্য দেয় ।

১৭৯। লেখকের অন্য একটি পুস্তক "খোদ শেনাসী বারা ' য়ে খোদসাজী " তে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ।

১৮০। বাকারা- ২৬৪, নিসা- ৩৮, ১৪২, আনফাল- ৪৭, মাউন- ৬।

১৮১। নিসা- ১২৪, নাহল- ৯৭, ইসরা- ১৯, তোহা- ১১২, আম্বিয়া- ৯৪, গাফির- ৪০, আনআম- ৫২ কাহফ- ২৮ , রূম- ৩৮, বাকারা- ২০৭, ২৬৫, নিসা- ১১৪, আল লাইল- ২০।

১৮২। 'হাবিত্ব ও তাকফির ' হল কোরানে বর্ণিত দু ' টি পরিভাষা। প্রথমটির অর্থ হল সৎকর্মের নিস্ফলতা আর দ্বিতীয়টির অর্থ হল পাপাচারের ক্ষতিপূরণ।

১৮৩। নিসা- ১১০, আলে ইমরান- ১৩৫, আনআম- ৫৪, রা- ২৫, যুমার- ৫৩ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

১৮৪। খোদা পরিচিত , পাঠ- ১১ দৃষ্টব্য

১৮৫। দোয়ায়ে কোমাইলে আমরা পড়ি :

فباليقين اقطع لو لا ما حكمت به   لجعلت الناركلها بردا سلاما و ما كانت لاحد فيها مقرا و لامقاما

১৮৬। وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ এবং (বাকারা- ১৮৫) يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (হাজ্জ- ৭৮)

১৮৭। তার রহমত, ক্রোধকে অতিক্রম করে।

১৮৮। গাফির- ৭, আলে ইমরান- ১৫৯, নিসা- ৬৪, মুমতাহিনাহ- ১২, ইব্রাহীম- ৪১, ইত্যাদি আয়াত দ্রষ্টব্য।

১৮৯। নবী (সা.) বলেন : শাফয়াতকে আমার উম্মতদের মধ্যে যারা বড় গুনাহে লিপ্ত হবে, তাদের জন্যে সংরক্ষণ করেছি (বিতার খঃ ৮ পৃঃ ৩৭- ৪০)।

১৯০। ইসরা- ৭৯

১৯১। অনুরূপ রূম- ১৩, আনয়াম- ৯৪, যুমার- ৪৩ দষ্টব্য ।

১৯২। খোদাপরিচিতি, পাঠ- ১৬।

১৯৩। ইমাম সাদিক (আ.) তার পবিত্র জীবনের অন্তিম মুহূর্তে বলেন : আমাদের শাফায়াত তাদের জন্য নয় যারা নামাযকে লঘুভাবে নেয় । (বিহারুল আনওয়ার থেকে)

১৯৪। মুনাফিকুন ৫- ৬।

১৯৫। নবী (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যারা আমার শাফায়াতে বিশ্বাস করে না মহান আল্লাহ তাদেরকে আমার শাফায়াতের অন্তর্ভূক্ত করবেন না (বিহার খঃ ৮)

১৯৬। যারা আল্লাহ ও তার নবীগণের প্রতি ঈমান এনেছে তারা তাহাদের প্রভুর নিকট সত্যবাদী ও শহীদ বলে পরিগণিত হবেন। (সূরা হাদীদ - ১৯)।

সূচীপত্র

Ńŀeপ্ম ফ়ŀd দিবসের পরিচিতির ট্মপ্ম ত্ম 5

Ńŀeপ্ম ফ়ŀR ʼn ŒĒÕS ক্সিপ্প RÓn সাথে ōট্র ŒĒlʼ 11

H ়ম ón ŒĒNľ'ৰ lʼ o 16

মাআদ বা Ńŀeপ্ম ফ়œনের দŒĒŃŀ·ł 22

ŃŒĒঠ źį ónŀR Ńŀeপ্ম ফ়ŀd দিবস 27

Ńŀeপ্ম ফ়ŀd দিবসকে ģ ম্মŒĒ ónį ónŒĒʼn দRঠʼn জবাব 33

ŒĒSŀNľʼ ōট্র Ŗ‹ দŋón দŒĒত্র ŒĒ 37

পরকালীন জগতের ŒĒRĵŌত্রōNÓ 42

NŖœ źĿ·Ŗ ŒĒSŀNľʼ 48

বারযাখ 54

ŃŒĒঠ źį ónŀR Ńŀeপ্ম ফ়ŀR ʼn ŒĒঠ 55

ইহকাল ও পরকালের NŖL৯ তুলনা 62

দুনিয়া ও আখেরাতের ōট্র į‹ 67

ইহ ও পরকালের NŖL৯ōট্র Ŗ‹n দįŖŒĒ 73

ģł ঠ সুখ ও দুঃখের ź৾ Ŗ ঈমান ও জ্ঞŉ Ŗnʼn ভূমিকা 77

ঈমান ও আমলের Ńónঙ্গ Œį ōট্র į‹ 85

į ŖSį ক্সিট্রাপ্ম ত্মŃĽ‹ বিষয় 89

į N‹ŒĒক্র Ŋ হওয়া ও পাপমোচন 95

ŒJ¡ও ŒR'n বিশেষ সুবিধা 100
শাফায়াত 103
į RSį বিজ্ঞōNō৯ón সমাধান 110
l' L·৯ōť : 115